শুকতারা

স্বর্ণখনির অন্তরালে

ষট্‌চত্বারিংশৎ বর্ষ
পঞ্চম সংখ্যা
আষাঢ়-১৪০০

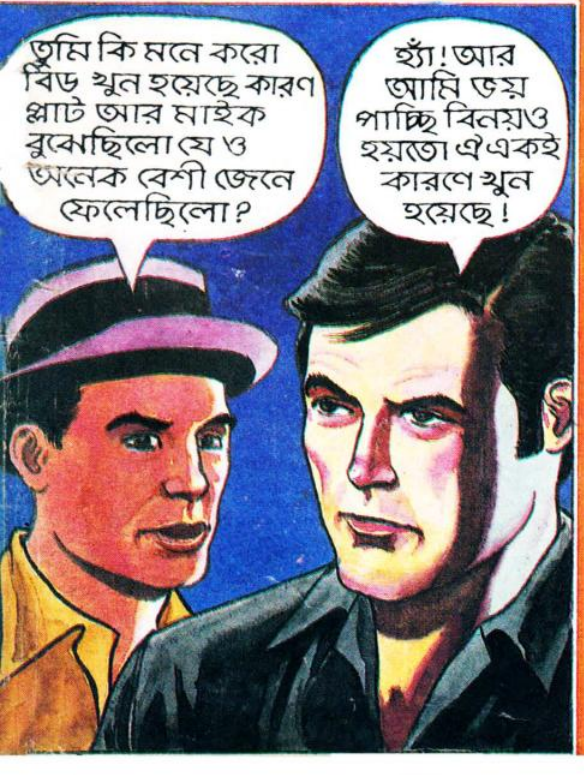

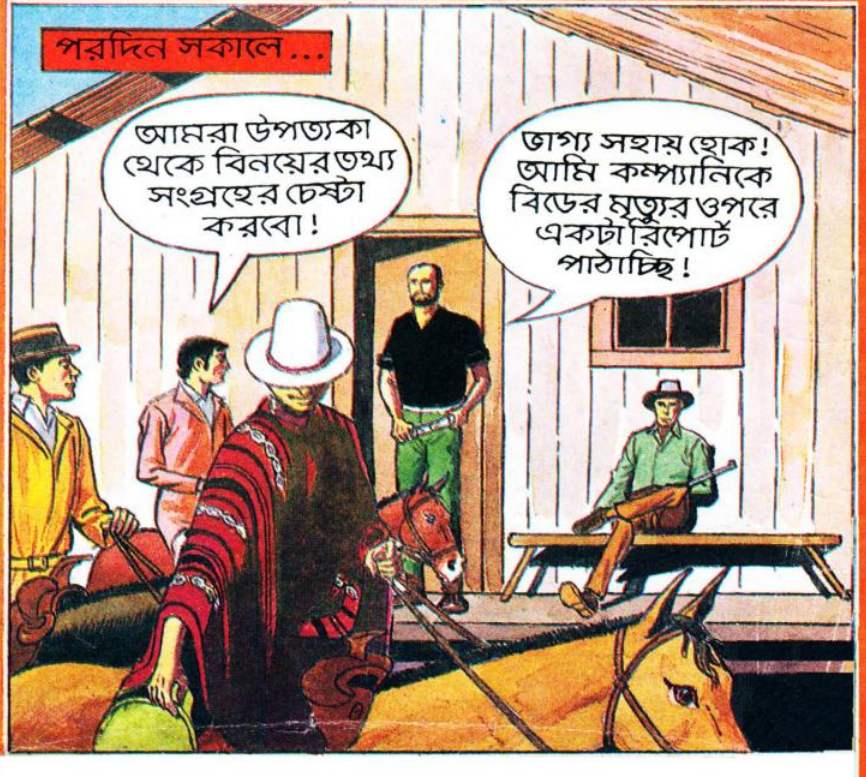

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - পৌষালী পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় কমিকস্ 'ডায়মন্ড কমিকস' প্রতি মাসে প্রকাশ করছে চাচা চৌধুরী,রমন, বিল্লু, পিঙ্কী, আর ফ্যান্টমের নিত্যনতুন এবং আকর্ষণীয় কান্ডকারখানা।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধুরী ওনার কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর বুদ্ধির জোরে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। জুপিটারবাসী অসীম শক্তিমান সাবু ওনার প্রধান সাহায্যকারী। শক্তি ও বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দেবে।

মধ্যবিত্ত কেরাণীর সমস্যা-গুলোর সঙ্গে অনবরত লড়াই চালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে আনন্দও দিয়ে আসছে কার্টুনিষ্ট প্রাণের অদ্ভূত চরিত্র রমন। পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মত হাসিতে ভরপুর রমনের নতুন কমিকস্।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি পিঙ্কী ওর দাদু আর ঝপটজীকে সঙ্গে নিয়ে অদ্ভূত-অদ্ভূত কান্ডকারখানা করে তোমাদের তো বটেই, অত্যন্ত গোমড়া-মুখোদেরও মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলছে।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি চঞ্চল চরিত্র বিল্লু ওর সঙ্গীসাথী গান্দু, জোজি আর বজরঙ্গী পালোয়ানকে নিয়ে তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য বুকষ্টলে হাজির হয়ে গেছে।

সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো সবার কাছে সমান মনোরঞ্জক। প্রাচীন কাল থেকে বংশানুক্রমে অসহায়ের বন্ধু এবং অপরাধীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত' ফ্যান্টমের সৃষ্টিকর্তা শ্রী লী ফক্।

ডায়মন্ড কমিকস্-এর নবতম নিবেদন

ব্রহ্মান্ডের অধিপতি 'হী-ম্যান' এখন বাংলাতেও ডায়মন্ড মিনি কমিকসে প্রকাশিত হয়েছে!

সংখ্যা ঃ 1-12

প্রতি সংখ্যার মূল্য ঃ 3/-

বিশ্ববিখ্যাত কমিকস্ 'স্পাইডার-ম্যান' এখন বাংলাতেও! সংখ্যা 1-2 ষ্টলে হাজির হয়ে গেছে।

মূল্যঃ 8/-

ষ্টীকার ফ্রী

DIAMOND COMICS (P) LTD.

2715, Darya Ganj New Delhi-110 002.

DISTRIBUTORS **VISHAL BOOK CENTRE** 4 TOTTEE LANE CALCUTTA-16

বাটুল দি গ্রেট

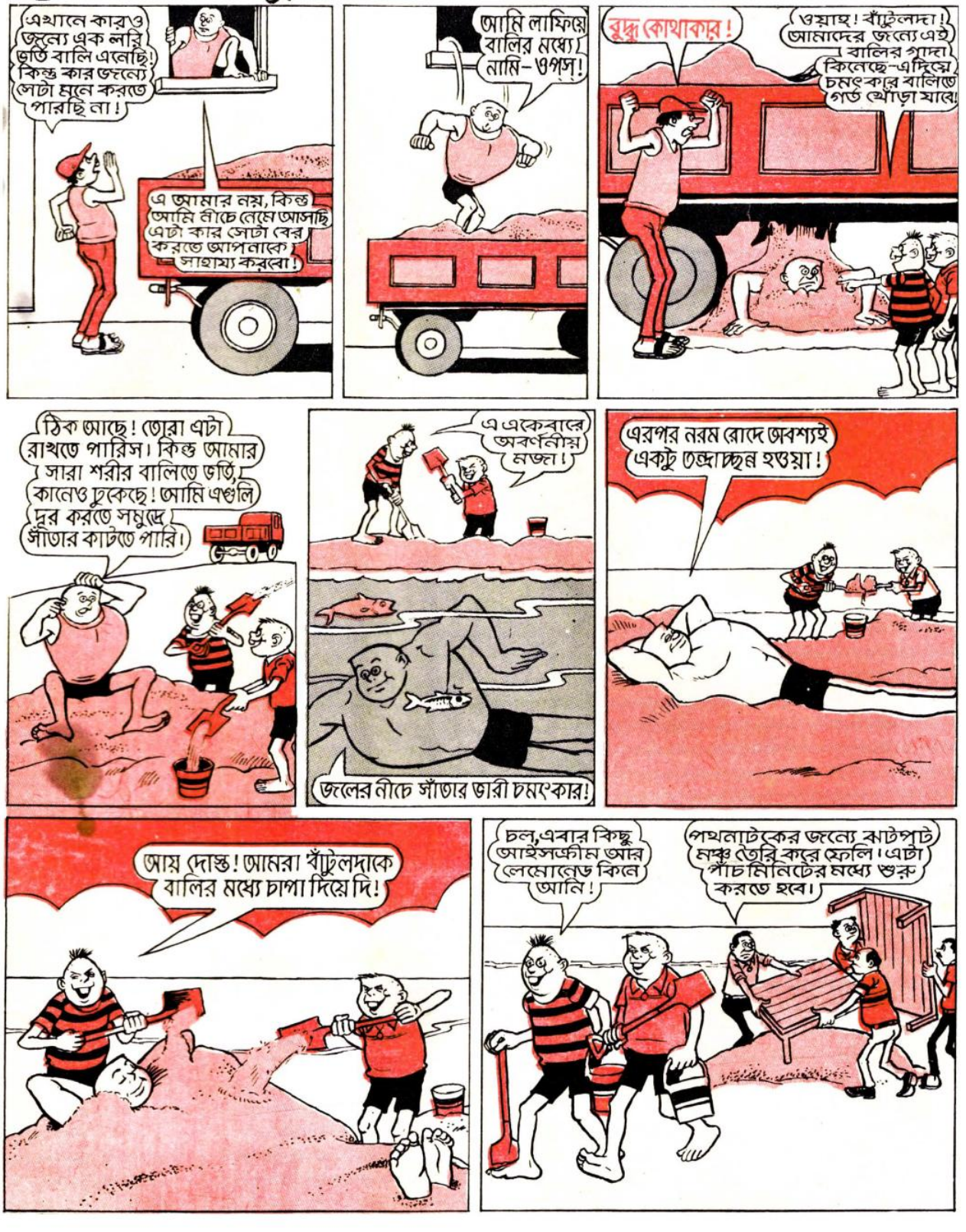
এখানে কারও জন্যে এক লরি ভর্তি বালি এনেছি! কিন্তু কার জন্যে সেটা মনে করতে পারছি না!
এ আমার নয়, কিন্তু আমি নীচে নেমে আসছি এটা কার সেটা বের করতে আপনাকে সাহায্য করবো!
আমি লাফিয়ে বালির মধ্যে নামি- ওপস!
বুদ্ধু কোথাকার!
ওয়াহ! বাঁটুলদা! আমাদের জন্যে এই বালির গাদা কিনেছে-এদিয়ে চমৎকার বালিতে গর্ত খোঁড়া যাবে!
ঠিক আছে! তোরা এটা রাখতে পারিস। কিন্তু আমার সারা শরীর বালিতে ভর্তি, কানেও ঢুকেছে! আমি এগুলি দূর করতে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে পারি।
এ একেবারে অবর্ণনীয় মজা!
জলের নীচে সাঁতার ভারী চমৎকার!
এরপর নরম রোদে অবশ্যই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া!
আয় দোস্ত! আমরা বাঁটুলদাকে বালির মধ্যে চাপা দিয়ে দি!
চল,এবার কিছু আইসক্রীম আর লেমোনেড কিনে আনি!
পথনাটকের জন্যে ঝটপট মঞ্চ তৈরি করে ফেলি। এটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে শুরু করতে হবে।

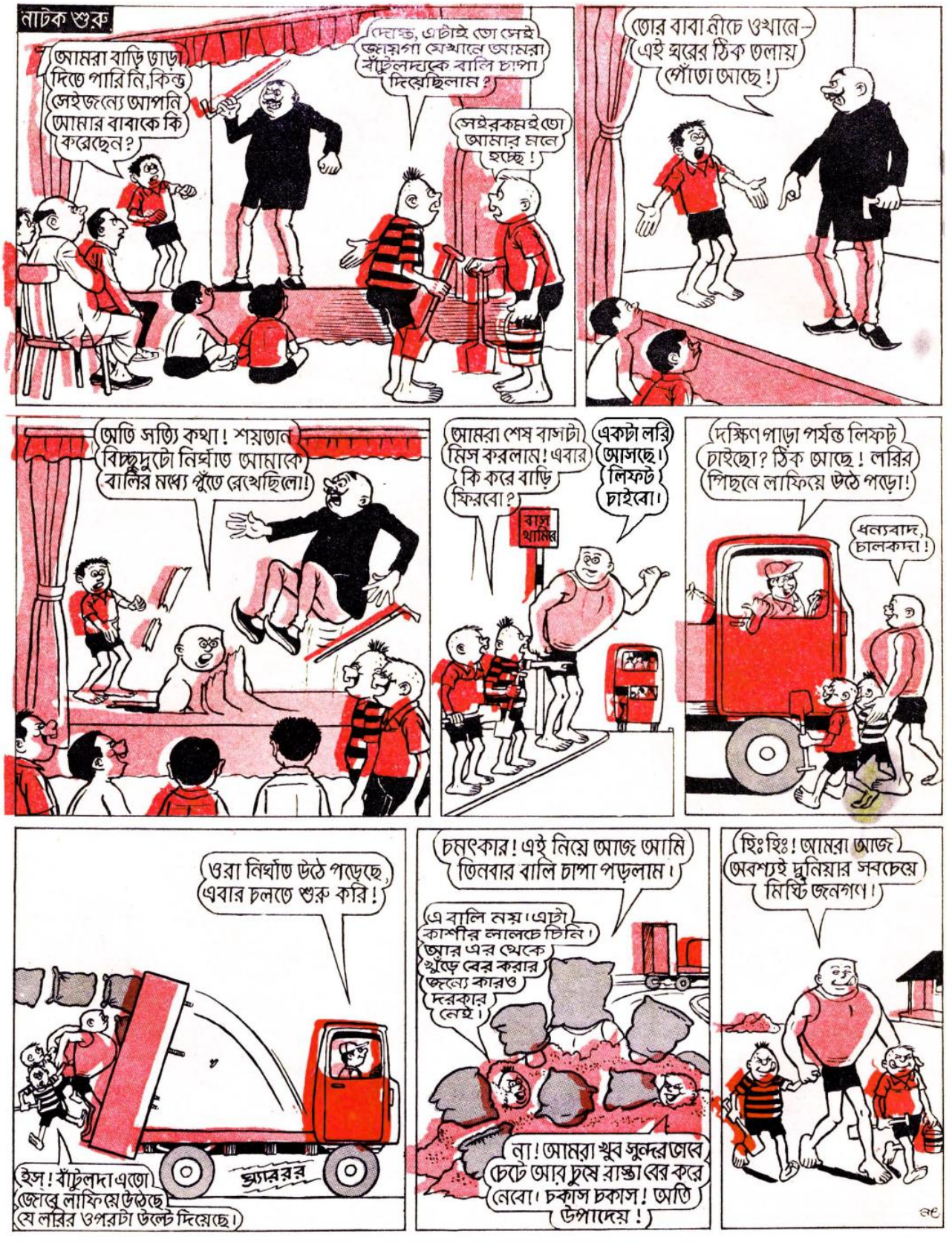
নাটক শুরু
আমরা বাড়ি ভাড়া দিতে পারি নি, কিন্তু সেইজন্যে আপনি আমার বাবাকে কি করেছেন?
দোস্ত, এটাই তো সেই জায়গা যেখানে আমরা বাঁটুলদাকে বালি চাপা দিয়েছিলাম?
সেইরকমই তো আমার মনে হচ্ছে!
তোর বাবা নীচে ওখানে- এই ঘরের ঠিক তলায় পোঁতা আছে!
অতি সত্যি কথা! শয়তান বিচ্ছুদুটো নির্ঘাত আমাকে বালির মধ্যে পুঁতে রেখেছিলো!
আমরা শেষ বাসটা মিস করলাম! এবার কি করে বাড়ি ফিরবো?
একটা লরি আসছে। লিফট চাইবো।
বাস্ থামার
দক্ষিণ পাড়া পর্যন্ত লিফট চাইছো? ঠিক আছে! লরির পিছনে লাফিয়ে উঠে পড়ো!
ধন্যবাদ, চালকদা!
ওরা নির্ঘাত উঠে পড়েছে, এবার চলতে শুরু করি!
ইস! বাঁটুলদা এতো জোরে লাফিয়ে উঠেছে যে লরির ওপরটা উল্টে দিয়েছে।
ভ্যাররর
চমৎকার! এই নিয়ে আজ আমি তিনবার বালি চাপা পড়লাম।
এ বালি নয়। এটা কাশীর লালচে চিনি। আর এর থেকে খুঁড়ে বের করার জন্যে কারও দরকার নেই।
না! আমরা খুব সুন্দর ভাবে চেটে আর চুষে রাস্তা বের করে নেবো। চকাস চকাস! অতি উপাদেয়!
হিঃ হিঃ! আমরা আজ অবশ্যই দুনিয়ার সবচেয়ে মিষ্টি জনগণ!

সূচীপত্র

আষাঢ় ১৪০০
জুন ১৯৯৩

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

বিশেষ ভৌতিক সংখ্যা

একগুচ্ছ ভূতের গল্প □
মাঝরাতের জলসায়
—শিশিরকুমার মজুমদার ২০
চেনাশোনা ভূত
—রবিদাস সাহারায় ৩৫
শয়তানের জাগরণ
—ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী ২৬
জবানবন্দী
—অসিতকুমার চৌধুরী ৪০
গাজোলের পীরবাবা
—পোপো মুখোপাধ্যায় ২৯
সেই দু'খানি পা
—বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২
প্রচ্ছদ □
স্বর্ণখনির অন্তরালে
—নারায়ণ দেবনাথ
শ্রদ্ধাঞ্জলি □
পরিব্রাজক বিবেকানন্দ
—স্বামী মুক্তিকামানন্দ ৫০
ধারাবাহিক □
অরণ্য[illegible] টারজান
([illegible]ভেঞ্চার)—সব্যসাচী ৪৬
জঙ্গল রহস্য (উপন্যাস)
—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৬
রূপকথার গল্প □
প্রথমা—কবীন্দ্রনাথ শীল ১২
জীবন থেকে নেওয়া □
কনরাড লোরেঞ্জের স্বর্গোদ্যান
— আরতি বসু ৭০
পুরস্কৃত গল্প □
দেবতা (প্রথম)
—চন্দ্রাণী দাশগুপ্তা ৬৮
শিশু গোপীনাথ (দ্বিতীয়)
— দেবরূপা দত্তরায় ৬৮
ফিচার □
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ৪৩
বিশ্ববিচিত্রা □
জিজ্ঞাসা ৬৫
সত্যি! ৪৯

কবিতা □
কাক-সুমারী—পঞ্চানন দে ৫
খেলোয়াড়—পরিতোষ চক্রবর্তী ৫৯
বিভাগীয় লেখা □
খেলা—শা· প্রি· ব· ৫৩
ক্লাব পরিচিতি—সুমন ভট্টাচার্য ৬০
পড়ার সঙ্গে খেলা
— অরুণাভ গুপ্ত ৬১
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
— তুষার শীল ৬২
দাদুমণির চিঠি ১৫
তোমাদের পাতা ১৬
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৬৩
ছবিতে গল্প □
যুগ যুগান্তের যাত্রী (রঙিন)
— ময়ূখ চৌধুরী ১৮
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
— নারায়ণ দেবনাথ ১
হাঁদা-ভোঁদা—নারায়ণ দেবনাথ ৪৪
বিলির বুট (রঙিন) ৬৬
ভয়ঙ্করের মোকাবিলায়
ম্যাম'জেল এক্স ১০
ঘোষণা □
'স্বামী বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি'
সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৬৯
নিতাইলাল সাহা স্মৃতি সাহিত্য
প্রতিযোগিতা ৬০
জানো কী ৪৯

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456 (17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - হাতে নিলে ৯০ টাকা। ডাকেঃ বুক পোস্টে - ১১০টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ১৭০ টাকা।

Annual Subscription
Bangladesh—**Rs. 235.00**
U.K. and U.S.A.—**By Sea Mail Rs. 327.00**
By Air Mail Rs. 552.00

R.N.I.
Registration **No. 2621/57**

দাম: ৮ টাকা মাত্র

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান

কমপ্লানেই আছে এদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩-টি খাদ্যগুণ।

সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা ১৫ বা ১৬ বছর বয়সের মধ্যে প্রায় সবদিক থেকেই পুরোপুরি ভাবে বেড়ে ওঠে। আর প্রোটিন-ই হল সেই প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ, যা সরাসরিভাবে এই বেড়ে উঠায় সাহায্য করে। তাই আপনার ছেলেমেয়েদের অবশ্যই চাই কমপ্লান।

কমপ্লানে আছে ২০% মিল্ক প্রোটিন, যা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের জন্যে আদর্শ প্রোটিন। এছাড়াও, এতে আছে আরো ২২-টি খাদ্যগুণ, যা ওদের সবদিকেই সুস্থ-সবল ভাবে বেড়ে ওঠার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়, ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

Chaitra Leo Burnett B GX 127/203 BEN

শুকতারা

৪৬শ বর্ষ ● ৫ম সংখ্যা ● আষাঢ় ১৪০০/জুন ১৯৯৩

কাক-সুমারী

পঞ্চানন দে

হরিসাধনের পিসে
জান কি ভাই এখন থেকে
মন দিয়েছেন কিসে?

ক'মাস হলো পাড়ায় পাড়ায়
গুনে বেড়ান কাক,
ব্যাপারটা কেউ জানতে চাইলে
বলেন, "এখন থাক।"

সকাল থেকে সন্ধ্যাবধি
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে,
কাকের খবর যোগাড় করে
আসেন ঘরে ফিরে।

হেঁড়ে কাক আর ভূষুণ্ডি কাক
সব পাড়াতেই থাকে,
খুঁজতে যত কাকের বাসা
থাকেন তাকে তাকে।

দাঁড়-কাক আর দাঁড়-কাকিনীর
খেচ-খেচানির চোটে
ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকেন
কন না কথা মোটে।

কাকের কা-কা শুনে শুনে
কানটি ঝালাপালা
তাই, আপাতত শেষ করেছেন
কাক-সুমারীর পালা।

ছবি: সৃফি

ধারাবাহিক রহস্য ও রোমাঞ্চকর উপন্যাস

জঙ্গল রহস্য

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

(পাঁচ)

কমলদা এসে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। ওদের মনোভাব বুঝতে ওঁর বিন্দুমাত্রও দেরি হলো না। হেসে বললেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওরা ফরেস্ট গার্ড। এখানে যখন তখন বাঘ এসে উৎপাত করে। তাই ওরা এইভাবে গার্ড দিয়ে দাঁড়ায়। ওদের দাঁড়ানোটা লক্ষ্য কর। একজন সামনের দিকে আর একজন পেছনের দিকে মুখ করে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্টিমার থেকে নামার জন্যে পাটাতন পেতে দেওয়া হয়েছিলো। কমলদার কথা শুনে মোমা ভয় পেয়েছিলো। নামতে নামতে বললো, এখন বাঘ আসতে পারে?

পারেই তো। পেছনে তাকিয়ে দ্যাখ কতো সরু খাল। এই খাল সাঁতরে বাঘ যে কোনো মুহূর্তেই আসতে পারে।

মোমা ভয়ে শিউরে উঠলো।

বাবু স্টিমার থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলো, জল থেকে যে গাছগুলো উঠে দাঁড়িয়ে আছে, যাদের শিকড়গুলো দেখা যাচ্ছে ওগুলো কি গাছ?

ওগুলো সুন্দরী গাছ। ঐ গাছ থেকেই তো এই বনের নাম সুন্দরবন।

ফরেস্টার রঞ্জন রায় এসে ওদের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। কেউ ওঁকে লক্ষ্য করেনি। গলা শুনে সকলে চমকে ওঁর দিকে তাকালো।

কমলদা হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। হ্যান্ডশেক করে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইনি তোদের রঞ্জনদা। এখানকার ফরেস্টার।

তারপর একে একে ওদের দেখিয়ে বললেন, এ মিউ, ও মোমা, ঐ যে বাবু আর ওর পাশে রাজা, মোমা ভয় পেয়েছে বলে ওর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে ২.।

আর আমি কিকি।

সকলে হেসে উঠলেন। কিকি গম্ভীর গলায় বললো, হেসো না, বাঘ আসতে পারে।

রঞ্জনবাবু বললেন, তোমরা তো সব ফেমাস। কেল্লা রহস্য, ভাঙা বাড়ির রহস্যর কথা আমি শুনেছি।

মোমা তাড়া দিল, চলো না তাড়াতাড়ি। এক্ষুণি যদি বাঘ আসে!

আমরা এতোজন আছি। এতগুলো রাইফেল রয়েছে। বাঘরা জানে। ওরা এখন আসবে না।

কখন আসবে?

আমরা ঘরে ঢুকে গেলেই আসতে পারে।

না বাবা, আমি এখানে থাকবো না। কমলদা, আমায় নিয়ে চলো।

ভীতু একটা! কিকি গলা ফুলিয়ে বললো।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওরা ফরেস্টারের বাড়িতে ঢুকলো। প্রথমেই একটা বড় ঘর। সেখানে টেবিল-চেয়ার পাতা। সুন্দরবনের একটা বড় ম্যাপ ঝুলছে। এইটাই ফরেস্টারের অফিস। ঐ ঘরটার পেছনে তিন চারটি ঘর নিয়ে ওঁর কোয়ার্টার। পুরো বাড়িটা বেশ খানিকটা উঁচুতে। চারপাশটায় বারান্দা। কাঠের শক্তপোক্ত বাড়ি। বাঘের পক্ষে ভাঙা সম্ভব নয়। ভাঙতে পারতো হাতি। তা সুন্দরবনে হাতি নেই।

চা আর ডিমভাজা খেয়ে বাবু আর মিউ এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। কিকি মিউ-এর কাঁধে বসে।

বাবুদাদা, দ্যাখো, কজন চাষী যে জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছে, ওদের বাঘে ধরবে না?

তাই তো! বাবু অবাক হয়ে চারপাশটা দেখতে লাগলো,

তারপর হেসে বললো, ঐ দূরে দ্যাখ্...

কি ?

দ্যাখ্ না, রাইফেল হাতে গার্ডটা পাহারা দিচ্ছে।

তাই তো! তাহলে আমরাও তো নিচে নামতে পারি।

তা পারি, তবে এখন নামার দরকার নেই। বেলা পড়ে এসেছে। দেখছিস জঙ্গলের দিকটা কিরকম অন্ধকার অন্ধকার ভাব।

কিকি হুস করে উড়ে গেলো। এক চক্কর ঘুরে এসে মিউ-এর কাঁধে বসে বললো, ঘরে চলো। বাঘ আসছে।

ধ্যাৎ। আজেবাজে বকিস না কিকি।

বাবু দেখলো চাষীরা তো চলে আসছে। গার্ডরাও ফিরে আসছে। কিকির দিকে তাকিয়ে বাবু জিজ্ঞেস করলো, বাঘ কোথায় ?

ঐদিকে। কিকি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখালো।

বাবু, মিউ-এর মনে হলো, কিকি খালের ওপারটা দেখাচ্ছে। ওরা ঘরে চলে এলো।

ঘরে তখন সকলে বসে গল্প করছেন। হঠাৎ বাঘের গর্জন ভেসে এলো। মোমা ভয়ে বুয়াকে জড়িয়ে ধরলো। বাবু বললো, কিকি তো ঠিক বলেছে!

কি বলেছে কিকি ?

আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম, কিকি এক চক্কর উড়ে এসে বললো, খালের ওপারে বাঘ, ঘরে চলো।

ঠিকই বলেছে কিকি। রঞ্জনবাবু প্রশংসার দৃষ্টিতে কিকির দিকে তাকালেন। বললেন, কিকির কথা আমি শুনেছি। কিন্তু ও যে এতো ভালো কথা বলতে পারে ভাবতে পারিনি।

মিউ একটু গর্বের হাসি হাসলো। হাজার হলেও ওই তো কিকিকে কথা বলতে শিখিয়েছে।

রাত্তিরে খেতে বসে কমলদা রঞ্জনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কাছাকাছি এমন কোনো জায়গা আছে কি যেখানে ওরা দু-চার দিন ক্যাম্প করে থাকতে পারে ?

সে কী, এই বাঘের রাজ্যে এই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো ক্যাম্প করে থাকবে!

না, না, আমি ঠিক সে কথা বলিনি। আমি জানতে চাইছি এমন কোনো জায়গা আছে কিনা যেখানে বাঘের ভয় নেই।

রঞ্জনবাবুকে একটু চিন্তিত দেখালো। তারপর 'এক্সকিউজ মি' বলে এঁটো হাতেই উঠে গিয়ে অফিসঘরে ঢুকলেন। মিনিট খানেক পরে রঞ্জনবাবু যখন ফিরে এলেন তখন ওঁর মুখটা হাসি হাসি। বললেন, একটা জায়গা আছে। তবে একটু দূরে। স্টিমারে অবশ্য ঘণ্টা তিনেকের বেশি লাগবে না। একটা ব্যারেন আইল্যান্ড। দু-তিন স্কোয়ার মাইলের মতো হবে। জঙ্গল। তবে গভীর নয়। ওখানে বাঘ যাওয়ার কোনো চান্স নেই। হিংস্র কোনো প্রাণী নেই। তবে কুমীর আছে। অবশ্য জল থেকে দূরে থাকলে ভয় নেই। দ্বীপটার মধ্যিখানে জঙ্গলের মধ্যে একটা পুকুর আছে। মিষ্টি জল। আর আছে অনেক বাঁদর আর বিস্তর পাখি। ওখানে ওরা নিশ্চিন্তে ক্যাম্প করতে পারে। কোনো ভয় নেই।

বাবু খুশি হয়ে বললো, তাহলে তো কালই যাওয়া যায়।

কমলবাবু পারমিশন দিলে নিশ্চয়ই যায়। রঞ্জনবাবু হেসে বললেন।

চাপা গলায় মোমা বললো, ওসব দ্বীপ-টিপে যাওয়ার কি দরকার রে—তার চেয়ে চল আমরা বরং টাকী ফিরে যাই।

চুপ কর। তোকে সকলে ভীতু বলছে না। তা ছাড়া তুই অতো ভয় পাচ্ছিস কেন—আমরা সকলেই তো আছি। বাবুদাদা আছে, রাজাদাদা আছে—ঘাবড়াচ্ছিস কেন রে ?

ওদের ফিসফিস করে কথা বলতে দেখে কমলদা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে ?

কিছু না কমলদা, মোমা জানতে চাইছিলো আমরা কখন যাবো।

তাই বল। আমি ভাবলাম, মোমা বুঝি ভয় পেয়েছে।

ভয় পাবে কেন কমলদা,ও তো আমাদের সব অ্যাডভেঞ্চারেই আছে।

পরদিন সকালবেলায় ওরা স্টার্ট করলো। রাত্তিরে ওদের ভালো ঘুম হয়নি। বারবার বাঘের ডাকে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। তবে ডাক শুনেই বোঝা যাচ্ছিলো, বাঘ বেশ দূরে আছে।

বেলা দশটা নাগাদ ওরা সেই দ্বীপটায় গিয়ে পৌঁছুলো। দ্বীপটার চারদিকে শুধু জল আর জল। ডাঙা দেখা যায় না। বড় বড় গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বীপের চারপাশটা চক্কর দিয়ে স্টিমারটা যেখানে এসে দাঁড়ালো সেখানে অনেক ইঁট-টিট পড়ে আছে। জলের মধ্যে পর্যন্ত চলে গেছে। সেখানেই পাটাতন নামিয়ে দেওয়া হলো। পায় কাদা না মেখেই ওরা দ্বীপে নেমে এলো। ওদের তাঁবু, খাবার-দাবার, স্টোভ, জলের পাত্র, ওষুধ-বিষুধ নিয়ে পুলিশের লোক এগিয়ে চললো জঙ্গলের মধ্যে। রঞ্জনবাবু যা বলেছিলেন, জঙ্গলের গভীরতা তার চেয়ে অনেক বেশি। তবে পুকুরটার চারপাশ বেশ পরিষ্কার। সেখানেই তাঁবু ফেলা হলো। একটা শোয়ার, অন্যটা রান্না আর জিনিসপত্তর রাখার। দুটো বড় টর্চ আর একটা ব্যাটারি দেওয়া এমারজেন্সি লাইটও আনা হয়েছে। লণ্ঠনও আছে একটা।

বাঁদরগুলো ওদের সঙ্গ নিলো।

তাঁবু যখন খাটানো হচ্ছিলো কিকিকে নিয়ে মিউ তখন এদিকে ওদিকে ঘুরছিলো। হঠাৎ ওর চোখ পড়লো একদল বাঁদরের ওপর। বাঁদরগুলোর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, ওরা যেন এদের দেখে ভীষণ অবাক হয়েছে। মিউ এগিয়ে গেলো ওদের দিকে। তারপর ওদের সঙ্গে ভাব হতে বেশি দেরি লাগলো না। কিকির সঙ্গেও ওদের বন্ধুত্ব হয়ে গেলো।

মিউ যখন পুকুরধারে ফিরে এলো তখন তাঁবু খাটানো হয়ে গেছে। কমলদা চেয়েছিলেন, রান্নাবান্না আর ফাইফরমাস খাটার জন্যে একজনকে রেখে যেতে। বাবু রাজী হয়নি। ওর কথা, নিজেদের কাজ নিজেরাই করবো। মজা তো তাতেই।

রঞ্জনবাবু বললেন, আর যাই করো, জলের ধারে বিশেষ যাবে না। জলে কুমীর আছে, কামোট আছে।

কামোট কি? রাজা জিজ্ঞেস করলো।

কামোট একরকমের হাঙ্গর। একটু ছোট তবে বড় সাংঘাতিক। ওদের দাঁতে এমন ধার যে জলের মধ্যে ডোবানো পা এমনভাবে মুহূর্তের মধ্যে কেটে নিয়ে যায় যে, কিছু বোঝাই যায় না। তাই আর যাই করো জলে নেমো না।

রঞ্জনবাবু থামতেই কমলদা বললেন, আমরা চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আসবো। তবে দিন সাতেকের মতো খাবার রইলো। তোরা রান্না শুরু কর। আমরা চলি। একটু সাবধানে থাকিস। তোদের খবর নেবার জন্য লোক পাঠাতে পারি।

একটু পরেই কমলদারা চলে গেলেন। ছোট্ট দ্বীপটাতে ওরা তখন শুধু পাঁচজন। বুম্বা ভালোই রান্না করে। ও খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়েছে। খিচুড়ি আর ডিমের ওমলেট—এই দিয়েই দুপুরে লাঞ্চ।

খেয়েদেয়ে ওরা দ্বীপটা ঘুরে দেখতে গেলো। কিছুদূর যাবার পরই বাঁদরগুলো ওদের সঙ্গ নিলো। বড় বড় গাছের পাশ দিয়ে ওরা যাচ্ছে। কিকি উড়ছে মনের আনন্দে। আর বাঁদরগুলো চলেছে গাছের ডালে। মিউএর পরিচিত বাঁদরগুলো অন্যদের ডেকে এনেছে। ওদের সঙ্গে মিউএর কথাবার্তাও চলেছে। মিউ খুব সহজেই জীবজন্তুদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারে। ওদের ভাষা বুঝতে পারে। নিজের কথা ওদের বোঝাতেও পারে।

ওরা ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো। একটু দূরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে মনে হচ্ছে যেন একটা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। ওরা সেই দিকে এগোতেই একটা বাঁদর এসে ওদের সামনে ঝুপ করে গাছের ওপর থেকে নামলো। তার হাতে এক ছড়া পাকা কলা। কলার ছড়াটা মিউএর দিকে এগিয়ে ধরলো। মিউ কলাটা নিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেই ও ছড়া থেকে একটা কলা ছিঁড়ে নিয়েই এক লাফে একটা গাছে উঠে বসলো। তাই দেখে ওরা হেসে উঠলো। কলাগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে খেতে খেতে ওরা এগিয়ে গেলো।

দুপুর গড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজ কমে যাচ্ছে। শীত শীত করতে শুরু করেছে। বাবু বললো, চল ফিরে যাই। সন্ধ্যের আগে রান্নাপাট চুকিয়ে ফেলতে হবে।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলো তার কাছেই অনন্ত জলরাশি। ঢেউগুলো এসে ভেঙে পড়ছে দ্বীপের গায়। কিছুদূরে হাল্কা কুয়াশার ঘেরাটোপ ওপর থেকে নেমে এসেছে জলের ওপর। একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে। ওরা তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ফিরে এলো। খেয়েদেয়ে ওরা যে কখন ঘুমিয়ে পড়লো তা ওরাই জানে না।

ওদের ঘুম ভাঙার আগেই পুব আকাশ আলো করে সূর্য উঠে পড়েছে। পাখিদের কিচির-মিচির আর বাঁদরদের লাফ-ঝাঁপের

শব্দ শুনতে শুনতে ওরা উঠে বসলো। টুথব্রাসে পেস্ট লাগিয়ে মিউ কিকিকে নিয়ে সকলের আগে তাঁবুর বাইরে এলো। বাঁদরদের দল পুকুরের পাশে গাছের ডালে লাফালাফি করছে। মিউকে দেখে ওদের উৎসাহ বেড়ে গেলো। কিকি উড়ে গিয়ে একটা গাছের ডালে বসেছে। দাঁত মেজে একটা গাছের গুঁড়ি বেয়ে পুকুরের জলের কাছে গিয়ে যখন মিউ মুখ ধুচ্ছে, তখন বাবু এসে ওর পেছনে দাঁড়ালো। চারদিকটা দেখতে দেখতে বাবু সন্দেহের গলায় বললো, এমন সুন্দর করে জলে নামার মতো করে গাছের গুঁড়ি কে ফেলেছে? এখানে কি লোক এসেছিলো?

বাবুর চোখে সন্দেহ খেলা করে। ততোক্ষণে রাজা এসে দাঁড়িয়েছে। বাবু বললো, দ্যাখ রাজা, এখানে নির্ঘাৎ আগেও লোক এসেছিলো।

আসতেই পারে। আমরা যেমন আসছি তেমনি আরো কেউ কেউ এসে হয়তো এখানে কিছুদিন থেকে গেছে। এতে অবাক হবার কিছু তো নেই।

কিন্তু এখন কেউ নেই তো? বাবুর মন থেকে সন্দেহ যায় না।

রাজা বললো, কি করে থাকবে? কাল তো আমরা পুরো দ্বীপটাই ঘুরে দেখেছি।

ওদের কথা শুনতে শুনতে মোমার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে বলে, সেই ছেলেধরার দলটা এখানে আসেনি তো?

হেসে উঠলো বাবু আর রাজা। বললো, সত্যি তুই না.....

পাঁউরুটি-জেলি, ডিমসেদ্ধ, কলা আর সন্দেশ দিয়ে ওদের জব্বর ব্রেকফাস্ট সারা হলো। তারপর ওরা গিয়ে বসলো সমুদ্রের ধারে।

মিউ বললো, বাবুদাদা, তোমরা সমুদ্র বলছো কেন?

সমুদ্র ছাড়া এ কী। যে দিকে তাকাবি শুধু জল আর জল। ডাঙ্গা দেখা যায় না।

সমুদ্র হলে তো জাহাজ-টাহাজ দেখা যেতো। কই একটাও তো দেখছি না?

এদিক দিয়ে বোধহয় যায় না।

তোরা এখানে বসে গল্প কর। আমি একটু ঘুরে আসছি।

বাবুকে উঠে দাঁড়াতে দেখে রাজা জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবি?

তাঁবুর দিকে যাচ্ছি। তুই ওদের কাছে থাক।

বাবু চলে যেতেই রাজা বললো, জায়গাটা বেশ, তাই না?

হ্যাঁ, খুব মজা লাগছে। আজ আর আমাদের কেউ বকার নেই। এটা করো ওটা করো, এটা খাও ওটা খাও, পড়তে বসো বলছে না কেউ।

আমার কিন্তু মার জন্য মন কেমন করছে।

মোমার কথায় ওরা হেসে উঠলো। মিউ বললো, তুই না....

ঘণ্টা দুই গল্প করে, ছুটোছুটি করে ওরা তাঁবুতে ফিরে এলো। ওরা ভেবেছিলো, বাবু তাঁবুতেই আছে। কিন্তু বাবুকে দেখতে পেলো না। রাজা বললো, কোথায় গেলো বাবুটা।

মিউ বললো, ভাবছো কেন, বাবুদাদা এক্ষুণি এসে যাবে।

যাই, একবার দেখে আসি। রাজা বেরিয়ে গেলো।

বুয়া রান্না চড়িয়ে দিয়েছে। ভাত, ডাল, আলুভাজা আর ডিমের ডালনা হবে।

বুয়ার তখন ভাত রান্না হয়ে গেছে। ডাল চড়িয়েছে। রাজা হন্তদন্ত হয়ে এলো। বললো, বাবুকে তো কোথাও দেখছিনে। কি হবে?

কি বলছো, রাজাদাদা? চলো তো একবার দেখি।

রাজা আর মিউ একরকম ছুটে বেরিয়ে গেলো। সারা দ্বীপটা ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজলো। বাবুকে পেলো না। মুখ চুন করে ওরা তাঁবুতে ফিরে এলো। ওদের মনে তখন হাজারটা প্রশ্ন। বাবুকে কুমীরে নিয়ে যায়নি তো?

মোমা কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, এখানেও নির্ঘাৎ ছেলে-ধরারা এসেছে।

বোকার মতো কথা বলিস না। মিউ ধমকে উঠলো।

বুয়া বললো, তোমরা খেয়ে নাও, চলো একসঙ্গে বাবুদাদাকে খুঁজতে যাই। বাবুদাদা নিশ্চয়ই কোথাও আছে। একটু পরেই এসে যাবে।

কিন্তু বাবু এলো না। ওরা সব জায়গায় খুঁজে সন্ধ্যে নাগাদ মুখ চুন করে তাঁবুতে ফিরে এলো। বাবুকে কোথাও পাওয়া গেলো না। কোথায় গেলো বাবু? কি হলো ওর? ওরা ভেবে পাচ্ছে না কি করবে এখন! কমলদাকে খবর দেওয়ার উপায়ও নেই।

হঠাৎ বুয়া বললো, রাজাদাদা টর্চটা একটু দাও তো, খাবার জল ফুরিয়ে গেছে, পুকুর থেকে নিয়ে আসি।

রাজা উঠে দাঁড়ালো। বললো, তোকে যেতে হবে না। আমি এনে দিচ্ছি।

বালতিটা নিয়ে রাজা বেরিয়ে গেলো।

অনেকটা সময় কেটে গেলো কিন্তু রাজা ফিরলো না। মিউ বললো, রাজাদাদা এখনো আসছে না কেন রে? চল তো বাইরে গিয়ে দেখি। তিনটি মেয়ে গিয়ে দাঁড়ালো পুকুরধারে। চারদিকে আবছা অন্ধকার। চোখ যাচ্ছে না বেশিদূর। হঠাৎ মোমা চিৎকার করে উঠলো, এ কী, বালতিটা এখানে পড়ে কেন?

ওরা ছুটে গেলো। বালতিটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। রাজার পাত্তা নেই। কোথায় গেলো রাজা?

(চলবে)

ছবি: বিজন কর্মকার

ভয়ঙ্করের মোকাবিলায় ম্যাম'জেল এক্স (গত সংখ্যার পর)

অ্যাভরিল ক্ল্যারি!
জার্মান কুত্তাগুলোকে গান শোনাবে! আমার যে ওর সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা ছিলো।
সব কথা বিশ্বাস করতে নেই। বরখের আদেশ মানা ছাড়া ওর কি উপায় আছে?
অ্যাভরিল ক্ল্যারি
গান গাইবে
থিয়েটার নেশান

তখন স্টেজের পেছনে ম্যাম'জেল এক্সের সঙ্গে ছুতোর মিস্ত্রী কথা বলছে।
কাজ শেষ ম্যাম'জেল। আমি বুঝতে পারছি না ওদের তুমি কি করে বোকা বানাবে।
ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

ওদিকে হলে নিজের সিটে বসে বরখ তখন অধৈর্য হয়ে উঠছে।
অনেক হয়েছে—এবার পর্দা তোল!

সরে গেলো পর্দা।
দারুণ! দারুণ!
(চলবে)

প্রথমা

কবীন্দ্রনাথ শীল

এক রাজা ছিলেন। রাজার ছিল সাত রানী। রাজার কোনো ছেলে ছিল না। তাই সুখও ছিল না রাজার মনে।

একদিন এক ঋষি এসে রাজার অতিথি হলেন। রাজা আদর-আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি রাখলেন না। ঋষি সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে সাতটি আম দিয়ে বললেন, তোমার সাত রানীকে এই সাতটি আম খেতে দিও।

আম খেয়ে সাত রানীর সাত-সাতটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে জন্মাল। যেন স্বর্গের সাত দেবী—এমনই তাদের রূপ!

সাত মেয়ের রূপ দেখে রাজা ছেলে না হবার দুঃখ ভুলে গেলেন। তাদের সঙ্গে সারাদিন সারারাত খেলতে পারলে তবে তিনি সন্তুষ্ট হতেন।

মেয়েরা একটু বড় হতেই রাজা তাদের প্রত্যেকের জন্য দেশ-বিদেশের পণ্ডিত রেখে পড়াশোনার ব্যবস্থা করলেন। মেয়েরা এইসব পণ্ডিতমশাইদের কাছে লেখাপড়া শিখতে লাগল।

একদিন রাজা মেয়েদের শিক্ষা কেমন হয়েছে তার পরীক্ষা করবেন বলে ঠিক করলেন। মেয়েদের ডেকে তিনি বললেন, ধর আমাকে অন্য এক রাজা পরাজিত করে বন্দী করে রেখেছেন। তিনি ঘোষণা করলেন 'যে যত বেশি পণ দেবে, রাজা তারই হবে।' এবার তোমরা আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় আমার পণ নির্ধারণ করে আমাকে বন্দীমুক্ত করবে।

প্রত্যেক পণ্ডিত, প্রত্যেক মেয়ে, প্রত্যেক রানী আর তাদের প্রত্যেক কুটুমের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে গেল।

প্রথম মেয়ের পণ্ডিত ছিলেন ধাতুবিদ্। তিনি সারা পৃথিবী তোলপাড় করে বিভিন্ন রকমের পাথর নিয়ে হাজির হলেন রাজপ্রাঙ্গণে। সে সব পাথর লোকে দেখেইনি, নাম বা গুণাগুণ জানা তো অনেক দূরের কথা।

দ্বিতীয় মেয়ের পণ্ডিত ছিলেন উদ্ভিদ্‌বিদ্। তিনি সারা পৃথিবী

তোলপাড় করে বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ্ নিয়ে হাজির হলেন রাজপ্রাঙ্গণে। সে সব উদ্ভিদের কোনোটার রং কালো, কোনোটার রং সাদা, কোনোটা আবার অর্ধেক সাদা অর্ধেক কালো। তার পাতাগুলো, ফলগুলোও সাদা আর কালোয় মেশান। কোনো গাছ আবার মুহুর্মুহু রং বদলায়।

তৃতীয় মেয়ের পণ্ডিত ছিলেন ফলবিদ্। তিনি পৃথিবী তোলপাড় করে নিয়ে এলেন বিভিন্ন জাতের ফল। সে সব ফলের বড় অদ্ভুত গুণ। যেমন একই ফল সকালে নোনতা, দুপুরে তেতো, বিকেলে মিষ্টি, রাত্রে টক লাগে।

চতুর্থ মেয়ের পণ্ডিত ছিলেন ফুলবিদ। তিনি সারা পৃথিবী তোলপাড় করে বিভিন্ন জাতের ফুল নিয়ে হাজির হলেন রাজপ্রাঙ্গণে। ফুলের গুণগান গেয়ে শেষ করা যায় না। ফুলের সৌরভে রাজপ্রাঙ্গণ ম-ম করতে লাগল।

পঞ্চম মেয়ের পণ্ডিত ছিলেন মৎস্যবিদ্। তিনি বিভিন্ন জাতের মাছ নিয়ে হাজির হলেন। সে মাছের কোনোটার দুটি মাথা, কোনোটার দুটি লেজ, কেউ মাথা নিচের দিকে করে এগোয়, কেউ বা লেজ নিচের দিকে করে সাঁতরায়।

ষষ্ঠ মেয়ের পণ্ডিত ছিলেন মনোবিদ্। তিনি সারা পৃথিবী তোলপাড় করে বিভিন্ন মানসিকতার মানুষ নিয়ে হাজির হলেন রাজপ্রাঙ্গণে। মানুষরাই বা কম কিসে ? যে মানুষটা একটু আগে হাসছিল, সে-ই পরমুহূর্তে রেগে আগুন! একটা মানুষকে পাগড়ি পরিয়ে হাতে বল্লম ধরিয়ে দাও, সে বলবে—আমি সৈনিক। তাকেই দোকানে বসিয়ে দাও, সে বলবে—আমি দোকানী। আবার সবকিছু খুলে নিয়ে তাকে বিবস্ত্র করে দিলে বলবে—আমি ভিখারী নয় বাবা, আমি সন্ন্যেসী।

সপ্তম মেয়ের পণ্ডিত হলেন সংখ্যাবিদ্। তিনি সারা পৃথিবী তোলপাড় না করে কেবল একটি এক পয়সা নিয়ে হাজির হলেন রাজপ্রাঙ্গণে।

অবশেষে বৈশাখী পূর্ণিমা এল। রাজা প্রথম মেয়ের কাছে গেলেন। প্রথম মেয়ে তার পণ্ডিতের আনা আশ্চর্য ধাতুগুলোর নানা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে রাজাকে বলল সে ওইসব অমূল্য ধাতু তাঁর মুক্তিপণ হিসাবে দেবে। ধাতুবিদ্যার ওপর তার পারদর্শিতা দেখে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—আজ থেকে তোমার নাম হলো রত্না। তিনি রত্নার পণ্ডিতমশাইকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে মেয়ের পাঠ শেষ করালেন।

তারপর রাজা দ্বিতীয় মেয়ের কাছে গেলে সে তার পণ্ডিতের আনা উদ্ভিদের অদ্ভুত আরোগ্যগুণ শুনিয়ে সে-সব দুর্লভ উদ্ভিদ্ রাজার মুক্তিপণ হিসেবে দেবে বলল। উদ্ভিদবিদ্যায় তার পারদর্শিতা দেখে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আজ থেকে তোমার নাম হলো বনানী। তিনি বনানীর পণ্ডিতমশাইকে এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে বনানীর পাঠ শেষ করালেন।

তৃতীয় মেয়ে রাজাকে তার ফলের গুণাগুণ শুনিয়ে সেই আশ্চর্য ফল তাঁর মুক্তিপণ হিসেবে দেবে বলল। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আজ থেকে তোমার নাম হলো তৃপ্তি। তিনি

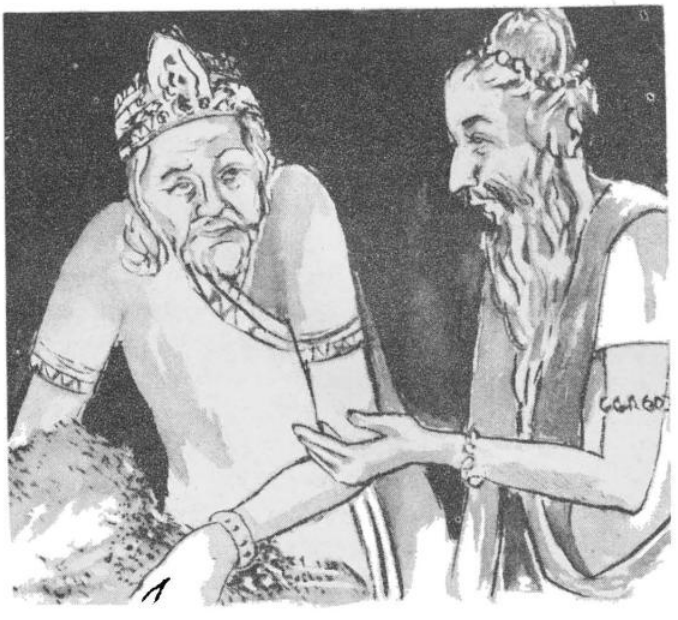

কেন, দশ দশ করে গুনতে পারতেন

তৃপ্তির পণ্ডিতমশাইকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে মেয়ের পাঠ শেষ করালেন।

তৃতীয়র পর চতুর্থ। সে তার রূপে-গন্ধে অতুলনীয় সারা পৃথিবীর ফুল মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইল। রাজা খুব খুশি হয়ে বললেন, আজ থেকে তোমার নাম হলো ফুলেশ্বরী। তিনি ফুলেশ্বরীর পণ্ডিতমশাইকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে মেয়ের পাঠ শেষ করালেন।

পঞ্চম মেয়ে পৃথিবী খুঁজে নিয়ে আসা বিস্ময়কর মাছগুলো মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইল। পরম আহ্লাদে রাজা বললেন, আজ থেকে তোমার নাম হলো সাগরিকা। তিনি সাগরিকার পণ্ডিতমশাইকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে মেয়ের পাঠ শেষ করালেন।

এরপর রাজা গেলেন ষষ্ঠ মেয়ের কাছে। ষষ্ঠ মেয়ে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ দেখিয়ে তাদের মুক্তিপণ হিসেবে দেবে বলল। মনোবিদ্যায় তার পারদর্শিতা দেখে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আজ থেকে তোমার নাম হলো মানসী। তিনি মানসীর পণ্ডিতমশাইকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে মেয়ের পাঠ শেষ করালেন।

এখন বাকি শুধু সপ্তম মেয়ে। না জানি সে কোন অমূল্য ধন সংগ্রহ করে এনেছে আমার জন্যে—ভাবতে ভাবতে রাজা গেলেন তার কাছে। সপ্তম মেয়ে শান্ত নম্রভাবে তাঁর হাতে তুলে দিল একটি পয়সা। তাই না দেখে রাজা রেগে একেবারে আগুন।

কী, এত বড় অপমান! আমার দাম এক পয়সা! তিনি পয়সাটি মেয়ের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, যাও, তুমি আজ থেকে রাজবাড়ির ঘুঁটেকুড়োনী হবে। তিনি সপ্তম মেয়ের পণ্ডিতমশাইকে বন্দী করলেন।

রাজা সুন্দর সুন্দর ছয় রাজপুত্রের সঙ্গে ছয় রাজকন্যার বিয়ে দিলেন। বাকী রইল কেবল ছোট মেয়েটি। সে তখন রাজবাড়ির দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। একেই বলে ভাগ্যের লিখন।

এইভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে যাবার পর একদিন সেই ঋষি রাজসভায় হাজির হলেন। রাজা তাঁকে খুব সমাদর করলেন। ভালমন্দ খাইয়ে-দাইয়ে রাজা ঋষিকে দক্ষিণা দিতে গেলেন। নিয়ম এই যে, ঋষি রাজসভায় এসে রাজসভার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। ঋষিরা দেবতুল্য লোক। তাই অযাচিতভাবে যে পুণ্য অর্জন করা হলো, তার জন্য অতিথি-সেবককেই দক্ষিণা দিতে হয়। কিন্তু ঋষি সে দক্ষিণা নিলেন না। তিনি বললেন, মহারাজ। আমি এক বস্তা সরষে এনেছি। এই বস্তায় ঠিক কটি সরষে আছে, তা যদি নিজে গুনে আমাকে বলতে পারেন, তবেই জানবেন আমাকে দক্ষিণা দেওয়া হলো।

রাজা প্রস্তাব শুনে তো প্রথমে থতমত খেয়ে ঢোক গিললেন। 'পারব না' বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু এই ঋষির কৃপায় তাঁর একটি নয়, সাত সাতটি সন্তান হয়েছে এই মনে হওয়া মাত্র তিনি আমতা আমতা করে বললেন, আ-প-নি যা-আ বলেন।

ঋষি বস্তাটি রাজসভায় উপুড় করে ফেলে দিলেন। সব সর্ষে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। রাজা মেঝেতে বসে সেই সর্ষে গুনতে লাগলেন। আর গোনা হয়ে গেলে বস্তায় ভরতে লাগলেন। কিন্তু সর্ষে গোনা তো চারটিখানি কথা নয়। তাও আবার এক বস্তা!

ঋষি এদিকে বহু দেশ ভ্রমণ করে বহুদিন বাদে আবার রাজসভায় এলেন। এসে দেখেন রাজা কোথায়? একটি শীর্ণ লোক, তার মাথার চুল জটার মতো পাকিয়ে গেছে, কত কাল স্নান করেনি, উবু হয়ে বসে একমনে মেঝেতে ঢালা সর্ষে গুনে চলেছে।

ঋষি রাজাকে থামতে বললেন। তারপর রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, কতটা সর্ষে এ পর্যন্ত গুনেছেন?

রাজা বললেন, দশ কোটি উনিশ লক্ষ পনের হাজার পাঁচ শত পঞ্চান্ন।

ঋষি বললেন, কী করে গুনলেন?

রাজা তো রেগেই ছিলেন, তার ওপর ঋষির এই প্রশ্ন শুনে রাগ আর চাপতে পারলেন না। কিন্তু যেই মনে এল, এই ঋষির কৃপায় একটা নয়, সাত সাতটি ডানাকাটা পরীর মতো কন্যারত্ন লাভ করেছেন, অমনি একটু নরম হয়ে বললেন, কেন? এক এক করে গুনেছি। প্রথমে একটা সর্ষে নিলাম, এক হলো। তারপর আর একটা সর্ষে নিলাম, আগের এক এখনকার এক মিলে দুই হলো। এইভাবে গুনেছি।

ঋষি বললেন, কেন? আপনি দশ দশ করে গুনতে পারতেন না? তাহলে কত তাড়াতাড়ি হতো বলুন তো?

রাজা আর স্থির থাকতে পারলেন না। ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, দশ দশ করে ভাগ দিয়ে গুনলে হয় বটে, কিন্তু দশের ভাগটি আসবে কী করে শুনি? তাও তো এক এক করে গুনতে হবে।

বলেই রাজা চমকে উঠলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, শরীরে রোমাঞ্চ হলো। তিনি ঋষির পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষার কথা, ছোট মেয়ের এক পয়সা দিয়ে রাজাকে কেনার কথা বললেন। সব শুনে ঋষি বললেন, আমি এসব অনেক আগেই শুনেছি। শুধু আপনাকে হাতে হাতে শিক্ষা দেবার জন্যই সর্ষে গুনতে দিয়েছিলাম। এবার যান এক্ষুণি মেয়েকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসুন। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

রাজা ছোট মেয়ের কুটিরে গেলেন, গিয়ে দেখেন, মেয়ে গোয়ালঘর থেকে মাথায় করে গোবর নিয়ে আসছে। পায়ে গোবর, মুখে গোবর, হাতে গোবর, সে এক বিচ্ছিরি চেহারা! এই মেয়ে যে রাজকন্যা তা বোঝবার উপায় নেই। রাজার দুঃখ হলো। কিন্তু দুঃখ চেপে রেখেই বললেন, ঠিক হয়েছে। আর কিছু পেলে না, এক কিনতে গেল। এই ঘুঁটেকুড়ুনি, বল না, তোর পণ্ডিত কী শিখিয়েছে, আর তুই কী বুঝেছিস?

মেয়ে কিন্তু বাবার কথায় রেগে গেল না। শান্তভাবে বাবাকে প্রণাম করে বলল, যাবতীয় সংখ্যা একে শুরু, একে শেষ। এক না হলে দুই নেই, তিন নেই, পাঁচ নেই, দশ, হাজার, কোটি কিছু নেই। এককে বাদ দিয়ে কোনো সংখ্যার কথা ভাবাও যায় না। আমরা যখন বলি দুই, তখনই মনে আসে তাতে ১ এবং ১ অর্থাৎ দুটি এক আছে। এ গেল যোগের কথা, বিয়োগের বেলাতেও তাই। যেমন, তিন থেকে দুই বাদ দিলে কত থাকে? গুণের বেলায়, ভাগের বেলাতেও তাই। বহুবার যোগের বদলে একবার যোগের নাম গুণ, বহুবার বিয়োগের বদলে একবার বিয়োগের নাম ভাগ।

ছোট মেয়ের এই উত্তর শুনে রাজা থাকতে পারলেন না। হু হু করে কেঁদে ফেললেন। তারপর মেয়ের হাত ধরে বললেন, চল মা ঘরে চল। তুই-ই আমাকে প্রথম বিদ্যা দান করলি। তোর অন্য বোনেরা যে বিদ্যা শিখেছে, তার দাম এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, কিন্তু তোর বিদ্যার দাম অমূল্য। তুই আমাকে এক পয়সা দিয়ে নয়, অমূল্যে কিনতে চেয়েছিলিস। আজ থেকে তোর নাম প্রথমা।

রাজা ছোট মেয়ের পণ্ডিতমশাইকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি তো দিলেনই, পণ্ডিতমশাইয়ের ছেলের সঙ্গে প্রথমার বিয়ে দিলেন। আর জামাইকে করে দিলেন যুবরাজ।

ছবিঃ শুকতারা রায়

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

যা গরম পড়েছে। তার ওপর আবার বর্ষা আসছে। আকাশের মুখ ভার। তাই তো আরো গুমোট। এই সময় কিছু ভালো লাগে না, তাই না? তোমরা তো জানো ২২ জুন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে বড় দিন। সূর্য উঠবে ভোর ৪টে বেজে ৫৪ মিনিট ১৩ সেকেন্ডে, আর ডুববে সন্ধ্যে ৬টা ১৯ মিনিট ১৭ সেকেন্ডে। এইবার হিসেব করে দেখো দিনটা কতো বড়।

যাক গে ও কথা। এখন যদি কোনোদিন মেঘমুক্ত আকাশ দেখতে পাও তাহলে কি দেখবে? তোমাদের কিন্তু আগেও বলেছি, আবার বলছি, আকাশের দিকে তাকিয়ে মিলিয়ে নিও। আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাবে পুব দিক ঘেঁষে থাকা ছায়াপথ। তার ঠিক নিচে ধনু রাশি। ধনু রাশির সবথেকে উজ্জ্বল নক্ষত্র দুটি—উত্তর আষাঢ়া আর পূর্ব আষাঢ়াকে দেখবে জ্বলজ্বল করতে। চিনতে কোনো অসুবিধে হবে না। এই মাসে কদম ফুল ফোটে। কদম ফুল লক্ষ্য করে দেখেছো কখনো? কি সুন্দর দেখতে তাই না? তাছাড়া কামিনী, হাসনাহানা, মল্লিকা, নানা জাতের লিলিও ফোটে এই সময়। আর গাছ-গাছালিরা বৃষ্টির জলে চান-টান করে কি সুন্দর সেজেগুজে থাকে। গ্রীষ্মের রুক্ষতার পর বর্ষা এসে প্রকৃতিকে নব প্রাণের উন্মাদনায় দুলিয়ে দেয়। বর্ষার সময় গাছ-গাছালির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো, মনে হবে ওরা যেন ফুল-বাবুটি সেজে আছে।

এবার তোমাদের চিঠির কথায় আসি। আজো তোমরা অনেকেই কোন ঠিকানায় চিঠি লিখবে, কোন ঠিকানায় তোমাদের পাতার জন্যে ছবি, লেখা পাঠাবে জানতে চাইছো। ঠিকানা তো শুকতারায় দেওয়া থাকে। ঐ ঠিকানায় পাঠালেই হবে।

রাজদীপ দাশ (c/o তপনকুমার দাশ, লুবস অ্যাণ্ড পার্টস এজেন্সি, ডিফু ধরমানালা রোড, পোঃ ডিফু, জেলা—খরবি অ্যাঙলং, আসাম-৭৮২৪৬০)

উত্তরঃ তোমাদের ওখানে শুকতারা পেতে যখন অসুবিধে হচ্ছে তখন তো আমার মনে হয় গ্রাহক হয়ে যাওয়াই ভালো। তাহলে বাড়িতে বসেই পেয়ে যাবে।

কুহেলী ঘোষ (c/o টি. কে. ঘোষ, রোড ১৬, এফ ৬/৪ নিউটাউন, পোঃ ছোট দিঘারী, বর্ধমান-৭১৩৩২৬)

উত্তরঃ তুমি যা চাইছো এবার থেকে শুকতারার প্রত্যেক সংখ্যায় তা ছাপার চেষ্টা করা হবে।

তাপসকুমার মুখোপাধ্যায় (জামালপুর, সাগরপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

উত্তরঃ তুমি পোস্টকার্ডেও ধাঁধা পাঠাতে পারো।

দেবাশিস সেন (দুর্গাপুর-৫)

উত্তরঃ তুমি দিয়েগো মারাদোনার বড় ছবি চেয়েছো। ক'মাস আগেই তো মারাদোনার বড় রঙিন ছবি ছাপা হয়েছে। দেখেছো নিশ্চয়ই।

সুবীরকুমার ঘোষ (c/o শ্রী গোপীনাথ ঘোষ, সোদপুর, প্রসন্ন চ্যাটার্জি রোড/মল্লিক বাগান, পোঃ ঘোলাবাজার, জেলা—উঃ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১৭০)

উত্তরঃ রোজ যে ভাই অনেক চিঠি আসে। তাই তোমার নাম ঠিকানা ছাপতে একটু দেরি হলো। এবার দেখো পত্রবন্ধু পাও কিনা।

পিণ্টু নাগ (c/o শ্রী সুনীলবরণ নাগ, পোঃ ও গ্রাম খণ্ডোঘোষ, বর্ধমান)

উত্তরঃ তোমার পরীক্ষা কেমন হলো? তুমি নিশ্চয়ই লেখা পাঠাবে। সম্পাদক মশাইয়ের ভালো লাগলেই ছাপা হবে।

দেবাশিস দত্ত (c/o বি. বি. দত্ত, ৪ পিয়ারীচরণ সরকার লেন, বেঙ্গলিতলা, ভাগলপুর, বিহার, পিন-৮১২০০১)

উত্তরঃ তোমার পুরো নাম ঠিকানা ছেপে দেওয়া হলো। তুমিও অন্যদের চিঠি দিও। তাহলেই উত্তর পাবে। তোমার লেখাটা তো ফেরত পাঠানো হয়েছিলো। আরো ভালো লিখতে হবে যে ভাই।

রিমলী অধিকারী (c/o শ্রী গুরুপদ অধিকারী, চাকদহ, নদীয়া)

উত্তরঃ তোমার টবে লাগানো গাছে অনেক ফুল ফুটেছে জেনে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। নিজের হাতে পোঁতা গাছে ফুল ফুটলে কেমন আনন্দ হয় বলো। হ্যাঁ, তুমি ইনল্যান্ড লেটারেও লেখা পাঠাতে পারো।

সৈকত সুব্বা (c/o শ্রী প্রেমবাহাদুর সুব্বা, পোঃ ও গ্রাম—কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা—নদীয়া, পিন-৭৪১৫০৬)

উত্তরঃ তোমার কথামতো গোয়েন্দা গল্প তো এখন প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই ছাপা হচ্ছে। খুশি তো?

আর তো জায়গা নেই। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয় হিন্দ।

—তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

এক হও

জাতে বেজাতে নাই ভেদাভেদ
এই কথাটাই জানি
ভাই হয়ে তবু ভাইয়ের রক্ত
নিয়ে কেন টানাটানি?
হিন্দু-মুসলিম একজাতি মোরা
এক সাথে আছি গাঁথা
সাম্প্রদায়িকতার লড়াই কেন আজ?
মনে জাগে বড় ব্যথা।
সব ভুলে এস হাতে হাত দিয়ে
এই কথাটাই বলি
ভুল বোঝাবুঝি শেষ করে
আজ এক সাথে মোরা চলি।

কার্তিক লাহা, বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী,
দোমোহানী কেলেজোড়া উচ্চ বিদ্যালয়, বর্ধমান।

উদয়ন ব্যানার্জী,
বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণী,
বার্নপুর বয়েজ হাই স্কুল,
বর্ধমান।

প্রথম লেখা

শুকতারার এক পাঠক আমি
পড়ি শুকতারা,
তাতে রঙিন রঙিন ছবি আছে
আছে মজার ছড়া।
ভূতের গল্প পড়েই সেথা
ভয়ের সূত্রপাত,
বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদা-ভোঁদা
করে বাজিমাৎ।
জানবার সব জিনিস আছে
আছে মজার গল্প,
সত্যি ভাল শুকতারাটা
আনন্দ নেই অল্প।
সব থেকে মজা আছে
তোমাদের পাতায়,
ছোট্ট ছোট্ট বন্ধুরা সব
গল্প, আঁকা পাঠায়।
তাই তো আমি ভালোবাসি
শুকতারাটা পড়তে,
নিজেই বসি সেই কারণেই
কবিতাটা লিখতে।

বিক্রম মুখোপাধ্যায়,
বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী,
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর

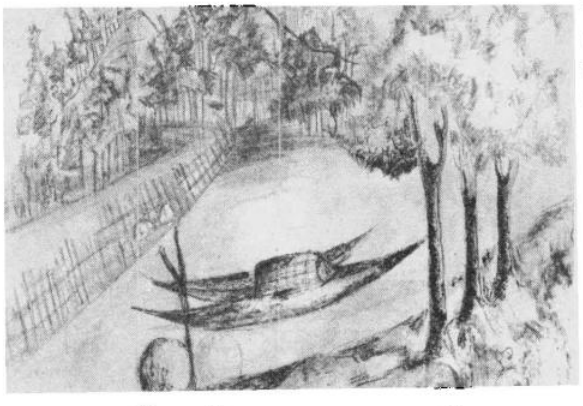

দেবাশিস পাইন, বয়স তেরো, নবম শ্রেণী,
গভঃ স্পনসর্ড মালটিপারপাস বয়েজ স্কুল, কলকাতা

কাজল

বিকেলে নদীর ধারে এসে সেই জায়গাটাতে বসলাম যেখানে আমি আর কাজল প্রায় বসতাম। কাজল তার লেখা কবিতা শোনাত, আমি মন দিয়ে শুনতাম। মাঝে মাঝে ওর কবিতা শুনতে শুনতে উদাস হয়ে যেতাম। ওর কবিতাগুলো আমাকে ভাবাত। ওর সব কবিতা ছিল জীবন মরণ নিয়ে।

কাজল ছিল খুব শান্ত-শিষ্ট ভাবুক প্রকৃতির। তাই স্কুলে যাওয়ার প্রথম দিনই ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। টানা ন'বছর ও আমার বন্ধু ছিল। আমাদের কোনো দিনও ঝগড়াঝাঁটি বা মতের অমিল হয়নি। কাজল আমার বন্ধু হলেও আমি ওকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। কারণ, ওর চিন্তাভাবনাগুলো ছিল খুব উঁচু স্তরের। ঠিক মনীষীদের মতো। আমি প্রায়ই ওর সব কথা বুঝতে পারতাম না। তাই ওকে বার বার জিজ্ঞাসা করতাম, এ কথার মানে কি? ও কথার মানে কি? ও কখনো বিরক্ত না হয়ে, আমাকে সেই কথাটা খুব সহজ করে বুঝিয়ে দিত। আজ সেই কাজল নেই, নিষ্ঠুর ব্যাধি তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আমি ভাবতে পারছি না ভগবান কেন এমন সুন্দর জীবন সৃষ্টি করে এত অল্প বয়সে তা শেষ করে দিলেন।

ভাবতে ভাবতে কখন যে সূর্য ডুবে গেছে খেয়াল করিনি। আকাশের দিকে তাকাতেই দেখলাম থালার মতো চাঁদ উঠেছে। আস্তে আস্তে বাতাস বইছে। কাজল তার একটা কবিতায় আমাকে বলেছিল—

আকাশের সঙ্গে মিশে আকাশ হব,
বাতাসের সঙ্গে মিশে বাতাস হব,
বন্ধু, পার যদি সনাক্ত কর,
আমি রব।

আমি সজল নয়নে ডাকলাম, কাজল তুই কোথায়? সারা আকাশ বাতাস জুড়ে মনে হলো কাজল বলল, এই তো আমি এখানে।

মলয় মুর্মু, বয়স পনেরো, নবম শ্রেণী,
কৃষ্ণনগর সি. এম. এস. হাইস্কুল, নদীয়া।

বর্ষাকাল

গ্রীষ্ম গেল বর্ষা এল,
ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি হলো।
রাস্তা ভরে হাঁটু জল,
প্যান্ট গুটিয়ে ছেলের দল।
মেঘের পরে মেঘ ভেসে যায়,
মন যে আমার খুশি হয়।

স্বরলিপি ঘোষ,
বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী, পাঠভবন, কলকাতা

মাছটা যে বেজায় বড় কেমন করে খাই
কেটেকুটে ভেজে দেবার মানুষ কোথায় পাই ?

দেবস্মিতা মুখার্জি, বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী,
লেকটাউন গভঃ স্পনসর্ড হাই স্কুল, কলকাতা

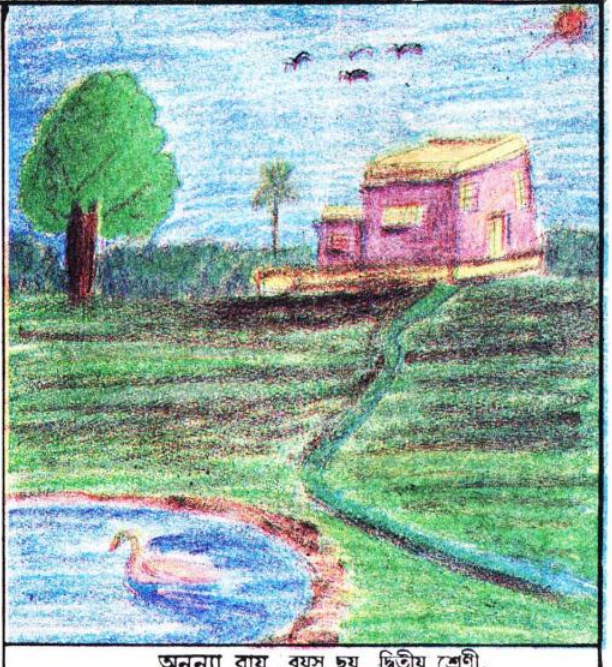

অনন্যা রায়, বয়স ছয়, দ্বিতীয় শ্রেণী,
মেরী ইম্মাকুলেট স্কুল, বহরমপুর

হিন্দু-মুসলিম

একই মায়ের ছেলে মোরা
হিন্দু-মুসলিম ভাই,
কে হিন্দু, কে মুসলিম
কেউ জানতে পারে নাই।
দুই জনেতে মিশেমিশে
থাকি এক ঠাঁই,
খাওয়ার জিনিস যখন পাই
দুইজনে মিলে খাই।
একই আকাশের নিচে মোরা
হিন্দু-মুসলমান,
মুসলিমের বাহুবল
হিন্দুদের জ্ঞান।

কামরুজ্জামান, বয়স উনিশ, দ্বাদশ শ্রেণী, খড়গপুর কলেজ

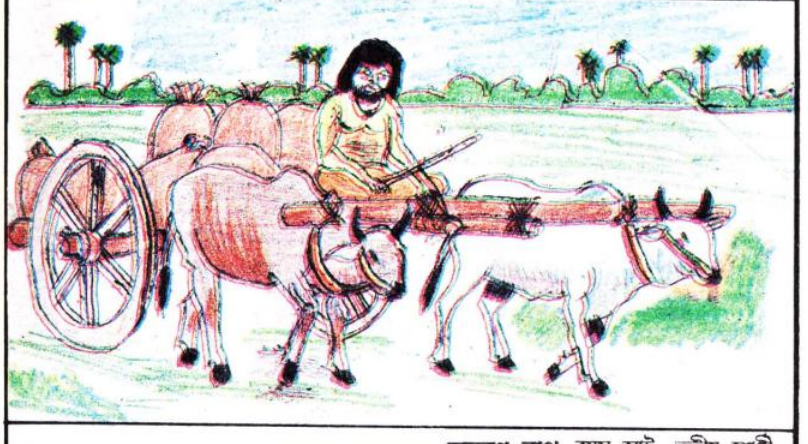

অনুরণ নাথ, বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী,
কোদালিয়া প্রসন্ন বঙ্গ বিদ্যালয়, সুভাষগ্রাম, দঃ চব্বিশ পরগনা

যুগ-যুগান্তের যাত্রী

ময়ূখ চৌধুরী

পূর্বে প্রকাশিত "অতিথি" ও "ভেলকির খেলা" যাদের পড়া হয় নি, তাদের সঙ্গে বর্তমান কাহিনীর দুই নায়ক তপেন ও দেবাশিস নামে কিশোর দুটির পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এবং পূর্বোক্ত কাহিনী দুটির সারাংশ সংক্ষেপে বলছি ...

ইউরেশিয়াস গ্রহ থেকে

পৃথিবীতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ঘুরে পশ্চিমবঙ্গে এসে "য়িবাসিস" ওরফে "দেবাশিস" কলকাতার এক শহরতলিতে তপেন নামে একটি কিশোর ছাত্রকে গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচায়। পরবর্তী কালে বিভিন্ন চমকপ্রদ ঘটনার ফলে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়। বন্ধুর বিচিত্র কীর্তি দেখে তপেনের ধারণা হয়েছে দেবাশিস জাদুবিদ্যা জানে, কিন্তু দেবাশিস সেকথা স্বীকার করে না। দেবাশিস বলে তার কিছু "ক্ষমতা" আছে বটে, কিন্তু সে জাদুকর নয়। তপেনের ধারণা ভুল কি নির্ভুল, পরবর্তী ঘটনা থেকেই আমরা তা জানতে পারব।

বর্তমানে দুই বন্ধু বালিগঞ্জে তপেনের মামার বাড়িতে এসেছে এবং সেখান থেকে একটি ক্যারাটে-প্রদর্শনী দেখে ফিরে আসছে, সঙ্গে রয়েছে তপেনের মামাতো দাদা নিখিল। প্রদর্শনীর শেষে রাস্তায় নেমে তারা জানতে পারল একটি বাসচালকের সঙ্গে যাত্রীদের বচসা ও মারামারির ফলে বাসচালকরা বাস বন্ধ করে দিয়েছে — অতএব পায়ে হেঁটেই তারা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল ...

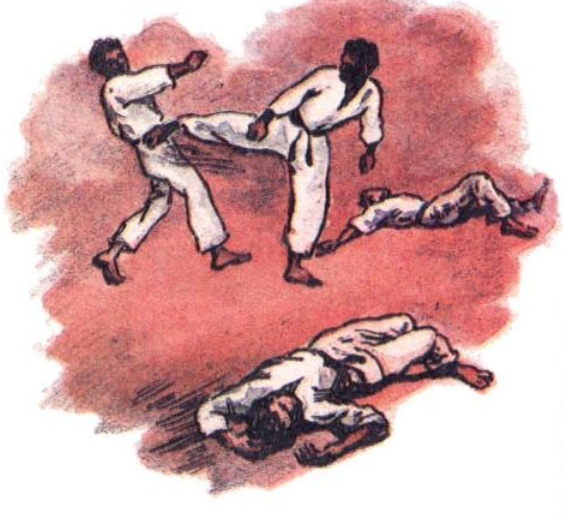

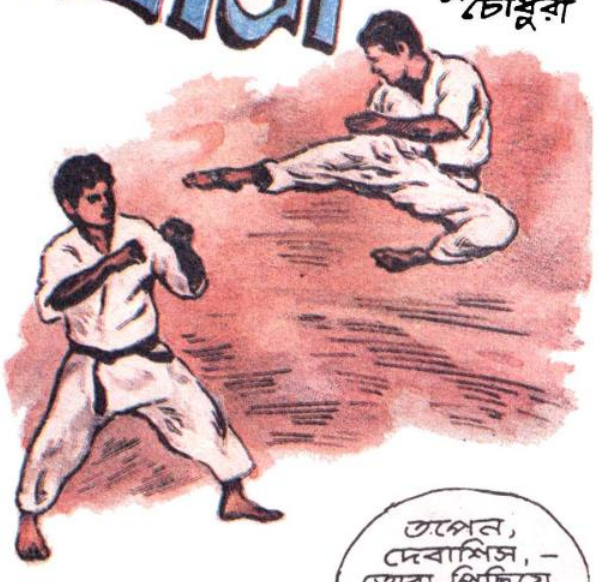

তুমি তো দেবাশিসের প্রশ্নের জবাব দিলে না। বলো না নিখিলদা' - তুমি একা তিনজনকে হারাতে পারবে ?
বাজে বকবক না করে জোরে পা চালা। সামনের গলিটা ধরে চললে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাব।
নিখিলদা' হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কেন ?
থমকে দাঁড়ানোর মতো কিছু চোখে পড়েছে নিশ্চয়।
তোরা দুজন এইখানে দাঁড়া - আমি আসছি...
ছিনতাই হচ্ছে!... গুণ্ডা তিনটেকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।
ব্যাগটা ছেড়ে দিন। একটা ব্যাগের জন্য জানটা দেবেন ?
তিনটে গুণ্ডা এক ভদ্রলোকের ব্যাগ ছিনিয়ে নিচ্ছে... আরে! আরে! দেখ দেবাশিস, নিখিলদা' যে ঐদিকেই যাচ্ছে - নিশ্চয়ই গুণ্ডাগুলোকে ও বাধা দেবে... সর্বনাশ করেছে - এখন কী হবে দেবাশিস ?
কী আর হবে ? আমরা জানতে চেয়েছিলাম নিখিলদা' একা তিনটে লোকের মহড়া নিতে পারে কিনা - সেই প্রশ্নের জবাব এইবার হাতে-হাতে পাওয়া যাবে।
না, না, আমি এইভাবে জবাব পেতে চাই না। এটা আপসে লড়াইএর আখড়া নয়। গুণ্ডাদের কাছে ছুরিছোরা থাকতে পারে - যদি নিখিলদা'কে ওরা ছুরি মারে ?
ঘাবড়াচ্ছো কেন ? দেখাই যাক না নিখিলদা' কেমন লড়তে পারে। তেমন কোন বিপদ ঘটলে আমি তো আছি। আমার উপর ভরসা রাখো তপেন।
৮-২

(চলবে)

মাঝরাতের জলসায়

শিশিরকুমার মজুমদার

প্রসন্ন বলল, 'এত রাতে ওখানে যাবার কি দরকার। জায়গাটা ভাল নয়। দিনের বেলাতেই তেমন লোকজন যায় না। আর তুই বলছিস এখন যাবি!'

ননী বারান্দায় পায়চারি করছিল। সেখান থেকে বলল, 'ভূতের ভয় আমার নেই। তাছাড়া এটা তো আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। তুই তো জানিস প্রসন্ন, রঘুর সঙ্গে আমার আর আজকাল মোটেও সদ্ভাব নেই। বাড়ি নিয়ে মামলাটাই এর কারণ। ও মামলায় আমি জিতেছি। তারপর থেকে রঘুর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি একদম বন্ধ হয়ে গেছিল। আর রঘুরাও তো কলকাতা ছেড়ে গাঁয়ে চলে এসেছিল। কদিন আগে হঠাৎ ওর চিঠিটা পেলাম। ওই তো তোর টেবিলে ওটা আছে, পড়ে দেখ না। এর পর আর আমার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয় কিছুতেই।'

প্রসন্ন টেবিলের ওপর থেকে চিঠিখানা তুলে নিল। খুলে পড়ল। অদ্ভুত চিঠি। লেখা আছে—

ননী, বন্ধু ছিলি, মিথ্যা মামলা জিতে শত্রু হলি। তোর তো খুব সাহস শুনি। আয় না আমার কাছে। মরতে বসেছি, এ অসুখ সারার নয়। মরার আগে তোর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করতে চাই। তোর জন্য অপেক্ষা করে থাকব আমাদের পৈত্রিক বাড়িতে। সেবাড়ি গ্রামের বাইরে 'ভবদুলাল ভবন'। আসবি কিন্তু সাহসী বীরপুরুষ।

রঘু।

প্রসন্ন বলল, 'আমার আপত্তি ওই বাড়িটা নিয়ে। চক গোবিন্দপুরের ভবদুলাল ভবনে মানুষ থাকে বলে শুনিনি। তবে ভেঙে পড়েনি, কারণ রঘুদের লোকজনরা ওটা নিয়মিত দেখাশোনা করে। তা রঘুরা তো ও বাড়িতে থাকে না। বিশাল খালি বাড়িটা তালা বন্ধ হয়েই পড়ে থাকে। ভূতের বাড়ি বলেই জানে সবাই এখানে। ওখানে ও তোকে গুম করতে পারে।'

বারান্দা থেকে ননী ঘরে এল। হাতঘড়ি দেখে বলল,'চলি। বাইরে সাইকেল রিকশা পাব নিশ্চয়ই। এখন রওনা দিলে সাতটা নাগাদ নিশ্চয়ই পৌঁছাব ওই ভবদুলাল ভবনে। দেখতে চাই ও আমার সঙ্গে এতদিন পরে কি ব্যবহার করে!'

'খুন করবে, নয় ভয় দেখাবে। হয়তো বা বোকার মতো তোকে দিয়ে নতুন দলিল লিখিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। অবশ্য সে দলিল টেঁকে না।' বলল প্রসন্ন। 'কিন্তু তোর গোঁয়ার্তুমির মানে হয় না। মামলার পর মুখ দেখাদেখিও বন্ধ তোদের দুজনের। তারপরও যখন তোকে আসতে লিখেছে ওই রকম ভাষায়, তখন তোর বোঝা উচিত, মুখোমুখি দেখাটা তেমন আনন্দের ব্যাপার হবে না। তবুও যদি যেতে চাস তো কাল সকালে যাস। রাতেই যেতে হবে তার কি মানে আছে?'

হাসল ননী, বলল, 'কলকাতা ছাড়ার আগে আমি গেছিলাম রঘুর প্রাণের বন্ধু রাখালের কাছে, সে তো আমারও বন্ধু। বলল, রঘুর নাকি ভীষণ অসুখ। কেমন আছে তা ও জানে না। তবে রঘুরা তো ও বাড়িতে থাকে না। ও বাড়ির সুনাম নেই। শুনেই মনে মনে আমি ঠিক করেছি রাতেই ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব। ওই যে দেখলি না, ও আমাকে বীরপুরুষ বলে ঠাট্টা করেছে। এটাই হবে তার উত্তর।' টেবিলের ওপর থেকে চিঠিখানা তুলে ভাঁজ করে পকেটে পুরল ননী। কোনও দিকে না তাকিয়ে বলল, 'স্টেশনে নেমেই তোর কথা মনে পড়ল, অনেক দিন দেখা হয়নি বলে দেখা করে গেলাম। এর সঙ্গে ও বাড়িতে যাওয়ার কোনো সম্বন্ধ নেইরে প্রসন্ন। চলি।' বলে ননী বার হয়ে গেল।

ভবদুলাল ভবনের সামনে সাইকেল রিকশাটা থামিয়ে রিকশাচালক জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাল বেশ কয়েকবার। ভেতর থেকে কারও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। রিকশাচালক বলল, 'আমি বলেছিলাম বাবু, কেউ থাকে না এখানে। ওই দেখুন কেউ সাড়াও দিচ্ছে না, কোথাও আলোও জ্বলছে না। আপনি কি নামবেন এখানে?'

তাকিয়ে তাকিয়ে বাড়িটা দেখছিল ননী। সত্যি কোথাও আলোর দেখা নেই। রঘু ওকে এখানে এসে দেখা করতে বলেছে, কিন্তু ও তো লেখেনি, সে এখানেই থাকে। তাছাড়া কদিন আগে ও খুব অসুখে ভুগেছে। এখন তাহলে তো ওর গ্রামের বাড়িতেই থাকা সম্ভব। সেখানেই যাবে নাকি ও এখন?

এ গাঁয়ে ও এর আগে কখনো আসেনি। প্রসন্ন ওখানে এসেছে এর আগে কবার। কলকাতায় প্রসন্ন আর রঘু ওর সঙ্গে একই কলেজে এক সঙ্গেই পড়ত। রঘু আর ও একই পরিবারের দুই শরিকের ছেলে। রঘুদের বাড়ির সবাই বরাবর দেশেই বাস করেছেন। অতীতে ননীর ঠাকুর্দা গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। গ্রামের সম্পত্তির মূলধনের জোরে কলকাতাতেও কিছু সম্পত্তি করেন তিনি। সেই সম্পত্তির কিছু অংশ দাবি করে বসে অন্য শরিকরা। তাই নিয়েই শেষ পর্যন্ত মামলা বাধে। মামলা চালু করেছিলেন ননীর বাবা, রঘুর বাবার অন্যায় দাবি ও দখলদারির বিরুদ্ধে। সেই মামলার নিষ্পত্তি হলো রঘু আর ননীর আমলে। দু'পক্ষের কর্তারা তখন পরপারে। ননীর পক্ষে রায় দিলেন বিচারক। জয়ের খবর পেয়ে ননী ছুটে গেছিল রঘুর কাছে। বলেছিল, 'আরে, তুই নাকি কলকাতা ছেড়ে দেশে চলে যাবি ঠিক করেছিস। কেন? ও বাড়ি তোকে ছাড়তে হবে না। তোর উকিলকে বল, ও বাড়িটা আমি তোকে দানপত্র লিখে পাকা করে দিয়ে দিচ্ছি। তাহলেই তো ঝামেলা মিটবে।'

ঝামেলা মেটেনি। ভীষণ রাগে রঘু শহর ছেড়েছিল। ও-ই মুখ দেখাদেখি বন্ধ করেছিল।

রিকশাওয়ালা বলল, 'বাবু, তাহলে গ্রামে এঁদের বাড়িতে নিয়ে যাই আপনাকে? সে বাড়িও আমি চিনি।'

তাই করতে যাচ্ছিল ননী। তখনি অন্ধকার বাড়িটার নিচের তলা থেকে একটা ডাক শোনা গেল। একটা দরজা আওয়াজ করে খুলে গেল। সাদা কাপড় পড়া একজন বাইরে বার হয়ে এলো। স্পষ্ট শোনা গেল তার কথা, 'কে? ননী এসেছিস নাকি? আয় আয়। আলো নেই দেখে চলে যাচ্ছিলি নাকি রে?'

এ যে রঘুর গলা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাড়াতাড়ি রিকশা থেকে নেমে পড়ল ননী। বাগানের গেট খুলে ভিতরে ঢোকার আগেই রঘু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ব্যঙ্গ করে বলল, 'অন্ধকার দেখে ভয়ে পালাচ্ছিলি না কি রে সাহসী পুরুষ। আমি তো তোকে এখানেই আসতে লিখেছিলাম। তবে?'

সেকালের জমিদার বাড়ি। বাগান সামনে, তার মাঝ দিয়ে পথ। সে পথের দুপাশে অন্ধকারে কিছু দূর দূর পাথরের মূর্তিগুলো কেমন যেন ভয় দেখানো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। এগোতে এগোতে ননী বলল, 'ভয় নয় রে রঘু। আলো নেই দেখে ফিরে যাচ্ছিলাম তোদের এখনকার বাড়িতে।'

রঘু ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এত রাতে এলি, কেউ তোকে কিছু বলেনি? ওই রিকশাওয়ালাটা?'

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে রঘুর সামনে দাঁড়াল ননী। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'না, না, কি বলবে। তোর দেখা না পেলে বিপদে পড়তাম এত রাতে। যাক সে কথা। চল ভিতরে চল। আলো জ্বালবি না?'

হি হি করে হাসল রঘু। বলল, 'আলো? কলকাতা থেকে এলি, লোডশেডিং জানিস না। দেখ, এখুনি হয়তো আলো এসে যাবে। আয় ভিতরে আয়।'

রঘুর পেছন পেছন ঘরের মধ্যে ঢুকল ননী। নাকে সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ লাগল ওর। যেন এঘরের দরজা জানালা বহু দিন খোলা হয়নি। থমকে দাঁড়াল ননী।

থমকে থেমে ঘাড় ঘোরাল রঘুও। হেসে বলল, 'কি হলো রে? আবার ভয় পেলি নাকি, বীরপুরুষ!'

'অন্ধকারে কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। এ ঘরের দরজা জানালাগুলোও সব বন্ধ নাকি রে?' আন্দাজে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলল ননী, 'মোমবাতি নেই? জ্বাল না। আমার অসুবিধা

ঢোকো ঘরেতে তুমি।

হচ্ছে।'

তখনি দড়াম করে আওয়াজ তুলে পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সে আওয়াজে চমকে উঠেছিল ননী। ঘরটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ডুবে গেল। অবাক ননী বলল, 'ওরে রঘু, কোন দিকে তুই, আলো না হলে এগোবো কি করে রে?'

সঙ্গে সঙ্গে রঘু বলে উঠল, 'আলো তো জ্বলবে নারে বীরপুরুষ। এ বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশন নেই। নেই কেরোসিন তেল, লণ্ঠন। এমনিই এগিয়ে চল। আমরা ওপরে যাব।'

'কি পাগলের মতো বকছিস! এ বাড়ি তোদের নিজেদের বাড়ি। এর আনাচেকানাচে তোর চেনা। অন্ধকারেও চলতে পারিস। আমি নতুন, শেষে কি ঠোক্কর খেয়ে ঠ্যাং ভাঙব? মোমবাতি বা লণ্ঠন আন।' বলে অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে রঘুকে ধরতে গেল ননী। ওকে সামনে না পেয়ে অবাক হয়ে বলল, 'এই রঘু, তুই কোথায় গেলি? আরে, অন্ধকারে আমি যে সত্যিই কিছু দেখতে পাচ্ছি না! আলোর ব্যবস্থা নেই এখানে?'

'না।' বেশ যেন জোর দিয়েই বলল রঘু, 'চল ওপরে চল, এখানে তোকে থাকতে হবে না।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে বেশ আওয়াজ করে অন্য দিকের একটা দরজা খুলে গেল। অন্ধকারেই বুঝতে পারল ননী, ওটা ভিতর বাড়িতে যাবার দরজা। আবছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে রঘু ডাকল, 'আয় আমার সঙ্গে।'

দরজাটা খুলে যাওয়াতে মনে মনে স্বস্তিবোধ করল ননী। রঘুর পেছন পেছন দরজা দিয়ে বাইরে বার হয়ে ও অবাকই হলো। ভিতর বাড়িরও কোথাও কোনোখানে আলো জ্বলছে না। বারান্দার শেষে একদিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা অন্ধকারের মাঝে আরও অন্ধকার হয়ে আছে। সেদিকেই এগোলো রঘু। বলল, 'আয় বীরপুরুষ, দোতলায় তোর থাকার ব্যবস্থা করেছি। সেখানেই সবাই তোর জন্য অপেক্ষা করছেন। আয়, আয়।'

কিছুটা এগিয়ে ননী জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে আর কে কে থাকে রে রঘু। শুনেছিলাম, তোরা নতুন বাড়িতে উঠে গিয়েছিলি, তাহলে?'

সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে রঘু বলল, 'থাকেন সবাই। ওপরে গেলেই তো তাঁদের দেখা পাবি। তাঁরা সবাই তো তোর জন্যই অপেক্ষা করে আছেন। তুই আমার এত বড় বন্ধু। তোকে তো সবাই আদর-যত্ন করবে রে।' ওর গলার স্বরে ব্যঙ্গের ঝাঁজ।

সিঁড়ির ধাপে পা রেখে ননী বলল, 'তুই দেখছি মামলার ব্যাপারটা এখনও ভুলিসনি। অথচ ও ব্যাপারে আমার তেমন দোষ ছিল না।'

'মিছে কথা বলিস না ননী।' বেশ যেন রাগ করেই বলল রঘু, 'ওসব মিছে কথা শুনতে ভাল লাগে না। তাছাড়া তোকে এখানে এখন ডেকে এনেছি মণ্ডা মিঠাই খাওয়াতে নয়। ডেকে এনেছি ওই মামলার ব্যাপারটাই নতুন করে মিটিয়ে ফেলতে। উঠে আয় ওপরে।'

বাঁক নিয়ে সিঁড়িটা সোজা উঠে গেছে দোতলায়। বাঁক ঘুরে ফের থমকে দাঁড়াল ননী। অবাক কাণ্ড, দোতলাতেও কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। এতক্ষণ একটানা অন্ধকারে থেকে, অন্ধকার ওর চোখে অনেকটা সয়ে গেছে। ও দেখল, দোতলার টানা বারান্দার একদিকে সারি সারি ঘর। তার প্রত্যেকটার দরজাই বন্ধ। অন্য দিকে বুক সমান উঁচু জাফরি কাটা রেলিং। ওদিকেই নিচে বোধ হয় ভিতর বাড়ির উঠান। রঘু বারান্দায় উঠে গেছিল। না ফিরেই বলল, 'থামলি কেন? আয় আয়, তোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছি। কোনো অসুবিধা হবে না তোর।'

আর উপরে না উঠে ননী বলল, 'তুই কি রঘু আমাকে ভয় দেখাবার জন্য এখানে এনেছিস? এ বাড়িতে তো দেখছি কেউ থাকে না। সব ঘর বন্ধ।'

হি হি করে হাসল রঘু। বলল, 'বাজে কথা। কে বলল সব ঘর বন্ধ। কোন ঘরটাতে তুই থাকতে চাস বল। প্রথম ঘরটা নাচঘর, ওটা থাক। দুনম্বরে থাকতেন দাদুর বাবা। একশ

বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। তার মধ্যে নব্বই বছর কাটিয়ে ছিলেন ওই ঘরে। পাশেরটা দাদুর ঘর। তিনিই তোর দাদুর বন্ধু ছিলেন। তাঁকেই তোর দাদু ভাল মানুষ পেয়ে ঠকিয়েছিলেন। তাঁর টাকায় কেনা কলকাতার বাড়ির দলিল নিজের নামে করেছিলেন। এ তো জোচ্চুরি! আমাদের পক্ষে অনেক সাক্ষী ছিল। কিন্তু তোর বাবা টাকা খাইয়ে তাদের মুখও বন্ধ করে দিল। আর তুই, জানতিস মামলাটা চালু আছে, অথচ আমাকে সে ব্যাপারে কোনো দিনও কোনো কথা বলিসনি, আপনজনের মতো হেসেছিস, গল্প করেছিস, এক সঙ্গে সিনেমা দেখেছিস, বাড়িতে এসেছিস, বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিস। শয়তান কোথাকার, ও সবই ছিল তোর ভড়ং। তলে তলে মামলায় এক তরফা রায় নেবার ফন্দি! আমাদের উকিলটাকে কত টাকা খাইয়েছিলি? কলকাতার অতবড় বাড়িটা স্রেফ ঠকিয়ে দখল নিলি। এই সবের আজ ফয়সলা করব বলেই তোকে ডেকে এনেছি রে বীরপুরুষ। এ বাড়িতে কেউ নেই বলছিস কেন? এ বাড়িতেই তো তাঁরা সবাই আছেন, যাঁদের তুই ঠকিয়েছিস। আয়, আয়, উঠে আয়, তিন নম্বরের ঘরটা খুলে দিচ্ছি। এখন বিশ্রাম কর। রাত দশটায় অমাবস্যা লাগবে। তখনই তাঁরা আসবেন, ফয়সলা হয়ে যাবে মামলাটা পাকাপাকি ভাবে। উঠে আয় তুই।'

থমকে গেল ননী। এই প্রথম ওর মনে কিছুটা ভয় ঢুকল। এ কি বলছে রঘু। এভাবে বাহাদুরী করে এখানে না আসাই উচিত ছিল ওর। অমন একটা চিঠি পেয়ে ওর অন্তত একবার ভাবা উচিত ছিল। রঘু ওকে নিয়ে এখন কি করতে চায়? ও বলছে এ বাড়িতে এখন আরও অনেকেই আছেন, আছেন তো তাঁরা কোথায় আছেন? সব ঘরগুলোই তো বন্ধ সামনে।

'উঠে আয় তুই। উঠে এলি?' যেন ধমকেই বলল রঘু। 'চুপ করে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই হবে? তোকে আসতেই হবে এখন ওপরে। নইলে যাবি কোথায়?'

সহজ হবার চেষ্টা করে ননী বলল, 'আচ্ছা, এসব কি পাগলামি করছিস তুই বল তো? ওপরে যেতে বলছিস, যাবটা কোথায়, দেখতেই তো পাচ্ছি, সব ঘরগুলো বন্ধ। আমার তো মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে তুই ছাড়া আর কেউ নেই।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের সব ঘরের সব দরজাগুলো এক সঙ্গে খুলে গেল। আর প্রত্যেকটা দরজা দিয়েই সাদা ছায়া ছায়া পোশাকপরা এক একজন মানুষ বার হয়ে এসে রেলিং-এর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। সবার শেষে বিশ্রী আওয়াজ তুলে সামনের একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। যেন বহু দিনের বন্ধ হয়ে থাকা জংধরা দরজা খুলল। অবাক ননী দেখল, তার ভিতর থেকেও সাদা ছায়ার মতো পোশাকপরা একজন দশাসই পুরুষ বাইরে এসে দাঁড়াল। যে দাঁড়াল সেও যেন ওকেই দেখছে।

রঘু বলল, 'ভীতু কোথাকার, বলেছি লোডশেডিং চলছে। ওই তো তোর থাকার ঘরের দরজা খুলে গেল। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন আমার আত্মীয়-স্বজনরা। সামনেই ঠাকুর্দা। তিনিই তোর সঙ্গে কথা বলতে চান। সেই জন্যই তো তোকে এখানে ডেকেছি। ওসব আলোর কথা ছাড় তো! ও নিয়ে আমি কখনও সত্যি বলব না। সত্যি যা তা হলো, এ বাড়িতেও অনেকে থাকেন।'

অনেকটা স্বস্তিবোধ করল ননী, বাকি ক'ধাপ উঠে ও বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে ও ঠাকরর্দাকে প্রণাম করতেই যাচ্ছিল। তিনি বলে উঠলেন, 'থাক থাক আর অত ভক্তির দরকার নেই। ওখানেই থাক। কেন তোমাকে ডাকা হয়েছে জান?'

বেশ অস্বস্তির সঙ্গে ননী বলল, 'না, তা ঠিক জানি না। রঘুর চিঠিটায় মাথামুণ্ডু কিচ্ছু নেই। কেন যে আসতে হবে আমাকে এখানে, তা নিয়ে কিছুই লেখেনি। শুধু আমাকে ভীতু কাপুরুষ বলে মনের ঝাল ঝেড়েছে।'

'তোমাকে ডাকা হয়েছে শাস্তি দেবার জন্য। যে অন্যায় তুমি করেছ তোমার বন্ধুর সঙ্গে, সে তো বিশ্বাসঘাতকতা। তার জন্য তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে।'

'মানে, আমাকে কি আপনারা বাগে পেয়ে গুম করে রাখবেন?' বেশ উৎকণ্ঠা নিয়েই বলল ননী। মনে মনে একটু ভয়ও পেল। লোডশেডিং কতক্ষণ চলবে এখানে। আলো আসবে না! দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সবাইকে যেন কেমন দেখাচ্ছে। কেমন যেন দেখাচ্ছে ঠাকুর্দাকে। মনে হচ্ছে হাওয়ায় ভাসা হাল্কা তাঁদের দেহ। স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছে না। তার ওপরে ঠাকুর্দার কথাগুলোও যেন কেমন ফ্যাসফেসে।

'ঢোকো ঘরেতে তুমি। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না।' ঠাণ্ডা গলায় বললেন ঠাকুর্দা, 'ঘরে ঢোকা ছাড়া আর তোমার অন্য কোনও উপায় নেই। ঘরে তোমাকে ঢুকতেই হবে।'

মনে অনেক সাহস এনে ননী বলল, 'আপনাদের এই সব পাগলের প্রলাপ শুনতে আমি এখানে অসিনি। ভেবেছিলাম রঘু সব ভুলে গেছে। হ্যাঁ, তা তো গেছেই। নইলে যে বাড়ি নিয়ে এত কথা, তা তো আমি মামলা জেতার পরই ওকে দানপত্র করে বিনা শর্তে দিতে চেয়েছিলাম। তা ও নিল না কেন? এখন আমাকে মিথ্যা দোষী করা হচ্ছে।'

'তুমি তো জুতো মেরে গরু দান করতে চেয়েছিলে, তা রঘু নেবে কেন? ওর কি মানসম্মান নেই? তাছাড়া বাড়ি দিয়েই দেবে তো অমন গোপনে অতদিন মামলা লড়লে কেন?'

এ কথার যে কি উত্তর দেবে তা ননী ভেবেই পেল না। মামলা লড়েছিলেন ওদের বাঁধা আইনজীবী। তিনি ছিলেন ওর বাবার একান্ত বন্ধু। অনেক বলা সত্ত্বেও তিনি কোনও কথাই শোনেননি। তার জন্য ওকে দায়ী করা অন্যায়।

পরক্ষণেই ওর মনে হলো, এ কথা বললে রঘু মানবে কেন? ও যে এ সব কথা এখন বানিয়ে বলছে না, তার প্রমাণ ও দেবে কি করে! ভয়ঙ্কর অস্বস্তিতে ননী বলল, 'ও মামলার জন্য আমি দায়ী নই। অনেক বলা সত্ত্বেও আমাদের উকিলমশাই ও মামলা চালিয়ে গেছিলেন। তাঁকে থামাতে পারিনি বলেই তো বাড়িটা আমি রঘুকে দান করে দিতে চেয়েছিলাম। তাহলে আমি আর কিসে দোষী?'

'ও সব তোমার বানানো কথা। আমাদের খপ্পরে পড়ে এখন বলছ। ও কথা আমরা বিশ্বাস করব না। এসো, ঘরে ঢোকো। ওই ঘরের মধ্যে তোমাকে আর তোমার অপবিত্র আত্মাটাকে বন্দী করে রাখব। কেউ জানবে না, কেউ শুনতেও পাবে না তোমার আর্তনাদ। এই ঘরেই চিরকাল বন্দী হয়ে থাকবে তুমি। এই তোমার শাস্তি। এস, এস, এস, সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে যাও। আর দেরি কর না। রাত অনেক হলো।' হঠাৎ সামনে দুহাত বাড়িয়ে দিলেন ঠাকুর্দা। বললেন, 'এই দুনিয়ায় এখন আর কারও ক্ষমতা নেই তোমাকে রক্ষা করে। এস, এস, এস।'

মনের সমস্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে খানিকটা এগিয়ে গেল ননী। বলল, 'এ আপনাদের অন্যায় জুলুম। আমার সম্বন্ধে যা তা ভেবেছেন। এখন আমাকে তেমনি মিছিমিছি বিপদে ফেলতে চান। আমি যদি না ঢুকি ঘরে, তাহলে আপনি কি করতে পারেন?' বারান্দার মাঝখানে থেমে বলল ননী।

'আমার কথা না শুনলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। আমি আঁধার ভৈরবকে জাগাব। সে তোমার চুলের মুঠি ধরে তোমাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দেবে। যাই কর আর তাই কর, শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে।'

'ঠিক আছে।' রুখে দাঁড়িয়ে ননী বলল, 'আমি আর ওদিকে এগোবই না। নিচে নেমে যাব। সেখান থেকে হেঁটেই স্টেশনে চলে যাব।' বলেই তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে ও সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে কোথায় বিশ্রীভাবে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। সেই ডাক থামার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটার অন্য কোনওখানে একটা বেড়াল ককিয়ে উঠল— ওঁয়াও ওঁয়াও ওঁয়াও। যেন বেড়ালটা বাড়ির কোনও ঘরে আটকা পড়েছে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে ননী সিঁড়ির বাঁকের মুখে এসে পড়ল। এ বাড়িতে আর ও একমুহূর্তও থাকবে না। বাঁক ফিরতেই কি যেন এসে সজোরে ওর মুখে থাপ্পড় মেরে গেল। আতঙ্কে শিউরে উঠল ননী। থমকে দাঁড়াল সিঁড়ির বাঁকে।

ওপর থেকে তখনি রঘুর গলা শোনা গেল, 'বীরপুরুষ পালাচ্ছিস? পালাবি কোথায়? এ বাড়িতে ঢোকা যায় বার হওয়া যায় না। উঠে আয়, উঠে আয় বলছি। এলি উঠে।'

এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে তিন চারটে করে সিঁড়ি লাফিয়ে নেমে ননী একতলার বারান্দায় এসে থামল। ডান দিকের একটা দরজা দিয়েই ও এখানে এসেছিল। সেই দরজাটা দিয়েই ও বাইরে চলে যাবে। অন্ধকার ওর চোখে একদম সয়ে গেছে। দরজাগুলো ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। প্রথম দরজাটা খুলল না, দ্বিতীয়টাও খুলল না। তাহলে ও কোন দরজা দিয়ে ভিতরে এসেছিল?

কানে এল ওর পিছনের সিঁড়িতে ভারী পায়ের আওয়াজ। কে যেন পা ঠুকে ঠুকে নামছে নিচে, থপ, থপ, থপ। সে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। পাগলের মতো তৃতীয় দরজাটাতে প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা মারল ননী। দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল। প্রায় মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে রয়ে গেল ননী। যাক বাবা, বাইরে যাবার পথ তাহলে ও খুঁজে পেয়েছে এতক্ষণে।

অন্য দিকের দরজাটার দিকে এগোলো ও। এগোতে ওকে হলো না। পিছনের দরজাটা প্রচণ্ড শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত ঘরটা জুড়ে ঘোর অন্ধকার ঘনাল। কোন দিকে যে কি তা আর বুঝতে পারল না ননী। আন্দাজে ও বাইরের দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওটা বন্ধ। ওটা ও কিছুতেই খুলতে পারল না। এই দরজাটা নয়, নিশ্চয়ই অন্য আর একটা দরজা আছে ঘরে, সেটা দিয়েই ভিতরে এসেছিল রঘু। দেয়াল ধরে ঘরের একদিক থেকে অন্য দিকে হাতড়ে বেড়াতে লাগল ননী। আছে, আরও দুটো দরজা আছে ঘরটাতে, কিন্তু সে দুটোও খোলে এমন শক্তি নেই ওর দেহে। ওকে এ ঘরের মধ্যেই বন্দী করেছে রঘু। কিন্তু কেন? কি করেছে ও রঘুর। মামলা জিতেও ও তো বাড়িটা দিয়েই দিতে চেয়েছিল। তাহলে ও কেন এমন করছে ওর সঙ্গে। সত্যি ভীষণ ভয় পেয়েছে ননী। যা করছে রঘু তা তো আর সহজভাবে নেওয়া যাবে না। ও তাহলে এখন কি করতে চায় ওকে নিয়ে? প্রাণে মেরে ফেলতে চায়? তা কি সম্ভব! কিন্তু ওর ঠাকুর্দা, তিনিও তো এর মধ্যে আছেন। তাঁর মতো বয়স্ক একজন!

আতঙ্কে শিউরে উঠল ননী। ঠাকুর্দা। তিনি তো কবেই গত হয়েছেন। তিনি আসবেন কি করে আবার? ছায়া ছায়া মূর্তিগুলো তাহলে কাদের? রঘু কি ওকে ভয় দেখিয়ে কিছু লিখিয়ে নিতে চায়। কিন্তু সে লেখায় ওর কি লাভ হবে। বাইরে বার হয়েই তো ও অস্বীকার করবে ওই লেখার কথা। তবে কি করতে চায় রঘু ওকে নিয়ে।

'মজা করতে চাই আমি তোকে নিয়ে।' ওর কানের কাছে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল রঘু।

আতঙ্কে ফিরে দাঁড়াল ননী। হ্যাঁ, ওর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে একজন! যার গলাই বলে দিচ্ছে সে রঘু। কিন্তু এই বন্ধ ঘরের মধ্যে এল কি করে ও? ঘরের কোনও দরজা তো খোলার শব্দ পায়নি ননী!

'আমাদের আর কিছুই বাধা দিতে পারে না। ওরে বোকা, ওরে গাধা, এখনও বুঝলি না আমরা কে? মামলার কথা গোপন রেখে, আমার বন্ধু সেজে, মনে মনে তুই খুব মজা লুটেছিলি। এখন আমিও তোকে এখানে এনে এই ঘরের মধ্যে বন্দী করে তেমনি মজা লুটছি। এ বাড়িতে কেউ আসে না। রাতের অন্ধকারে আমরা ঘুরে বেড়াই আনাচে কানাচে। আমরা যে মুক্তি পাইনি রে। পাব কি করে বল? ভালমানুষ আমার ঠাকুর্দাকে তোর ঠাকুর্দা ঠকিয়েছিল। যখন সে কথা ঠাকুর্দা বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর সে কি হাহাকার। তাঁর সেই হাহাকারই আজও তাঁকে এই বাড়ির মধ্যে আটকে রেখেছে। তারপর আমার সঙ্গে তুই বিশ্বাসঘাতকতা করলি। আমি মরার আগে পর্যন্ত সে কথা ভুলতে পারিনি। আমিও তাই মুক্তি পাইনি। আজ তোর সঙ্গে শেষ খেলা খেলে তৃপ্তি পাব। কি জানি, তখনই হয়তো আমার, আমার ঠাকুর্দার মুক্তি। উঃ! কি যন্ত্রণা নিয়েই না আমরা দুজনে এই

বাড়িটার চার দেওয়ালের মধ্যে ঘুরে মরছি। আয় না কাছে আয়, তোকে ভাল করে বুঝিয়ে দিই কি যন্ত্রণা আমাদের।'

এক ছুটে ননী ওদিকের দরজাটার উপর আছড়ে পড়ল। সে কালের মজবুত মেহগনি কাঠের দরজা একটুও নড়ল না।

হি হি করে হেসে উঠল রঘু। অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে ডাকল, 'ও ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দা, এসো, এসো, দেখে যাও কি মজা! খাঁচায় আটকা পড়া ইঁদুরের মতো করছে ও। এসো না দেখে যাও। আর, আপনারাও আসুন সকলে, যে যেখানে আছেন।'

না, ঘরের কোনও দরজা খুলে যাবে না। সব কটাই শক্ত করে বন্ধ করা। সত্যিই খাঁচাকলে আটকা পড়া ইঁদুরের মতোই অবস্থা ওর। এখন যদি ও বুদ্ধি হারায় তো সর্বনাশ হবে। যাই কেন ঘটুক না, ওকে সাহস দেখাতেই হবে। তা না হলে ওরা পেয়ে বসবে। এদিক ওদিক তাকাতে থাকল ননী।

রঘু বলল, 'তোর মনে আছে ননী, সে দিনটা ছিল আমাদের বাড়িতে উৎসব। আমার গানবাজনা ভাল লাগত। ওস্তাদ বিলিমোরিয়া এসেছিলেন সেদিন। গান বেশ জমে উঠেছিল। এমন সময় মাখনবাবু, আমাদের সরকারমশাই, আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, তোর মামলা জেতার কথাটা! তুই জানতিস। তুই আমাকে কিছু না বলে, আমারই ঘরে বসে মাথা দুলিয়ে গান শুনছিলি! সে দিনের কথাটা আজও আমি ভুলিনি রে। আজও এখানে গানের জলসা হবে। তুই শুনবি, আর আমরা সবাই বসে বসে খুশিতে মাথা দোলাব।'

কথার শেষে ও দুবার হাতে তালি মারল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা নরকের আলোর আভাস জাগল। বাইরের দরজাটা আঁকড়ে ধরে ননী তাকিয়ে দেখল, ঘরের মাঝখানে ফরাস পাতা। ওস্তাদ কানে হাত চাপা দিয়ে গান গাইছেন, তার ভাষা শুনে আঁতকে উঠল ননী।

আয় জেগে আয় অন্ধকারের শব তোরা।
নরক জাগা গান শোনাব আজ তোদের।
আসর ঘিরে বস না তোরা সদ্য মরা আনকোরা।
বাজবে হাড়ের খটখটানি বাদ্য মধুর।
কলজে ছেঁড়া সুরের সাথে ধর না তোরা,
শ্মশান জাগা গুমরে ওঠা হাওয়ার সুর।

গানের মাঝেই রঘু এগিয়ে এল ননীর দিকে। হি-হি করে হেসে বলল, 'কিরে এখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, তোর সম্মানে গান গাইছেন ওস্তাদ, বস এসে, বাহবা দে, মাথা দোলা, তা না হলে গানে উনি উৎসাহ পাবেন কি করে?'

ওর কথা শেষ হতেই আসরের সবাই মুখ ফিরিয়ে এক সঙ্গে বলল, 'তা তো নিশ্চয়ই, তা তো নিশ্চয়ই। আসুন আপনি, বসুন এসে।'

শিউরে উঠল ননী। আসর ঘিরে বসে থাকা যারা ওর দিকে ফিরে তাকিয়েছে, সব কজনেই কঙ্কাল। মাঝখানে তানপুরা হাতে গান গাইছে যে ওস্তাদ সেও কঙ্কাল।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ননী। প্রাণপণ শক্তিতে দরজাটা ধাক্কা

আয় না কাছে আয়

দিতে লাগল। বিকট আওয়াজ করে দরজাটা খুলে গেল। প্রায় ছিটকে বাইরে বার হয়ে এল ননী। পিছনে প্রাণ-কাঁপানো অট্টহাসি উঠল। পড়িমরি করে ছুটে ননী গেটের বাইরে এসে পড়ল। আবারও ছুটতে যাচ্ছিল ও। হঠাৎ যেন সামনে এসে থামল একটা সাইকেল রিকশা। রিকশা থেকে প্রসন্ন চেঁচিয়ে উঠল, 'ভয় পাস না ননী, ভয় পাস না। আমি প্রসন্ন।' ননী ওখানেই ঢলে পড়ল।

তারপর যখন ও চোখ খুলল, ও শুয়ে আছে প্রসন্নর ঘরে। প্রসন্ন ওকে তাকাতে দেখেই বলল, 'যাক বাঁচালি। যা চিন্তায় ফেলেছিলি!'

কেমন যেন চোখে তাকাল ননী ওর দিকে।

প্রসন্ন বলল, 'তুই চলে যেতেই আমার মনে হলো কাজটা ভাল করলাম না। তোর পেছন পেছন রিকশা নিয়েই ছুটেছিলাম। আগে গেছিলাম রঘুদের এখনকার বাড়িতে। ওখানে সবাই বললেন, মাস দুই আগে রঘু মারা গেছে। শুনে অবাক হলাম, তাহলে রঘুর নামে কে তোকে চিঠি দিল? এর মধ্যে গোলমাল আছে বুঝেই চলে এসেছি এখানে। তা তুই অমন পাগলের মতো ছুটছিলি কেন?'

তখনি ননীর মনে পড়ল রঘুর চিঠিটার তারিখ প্রায় আড়াই মাস আগের। তাহলে ওই ভয়ঙ্কর চিঠিটা রঘু বেঁচে থাকার সময়ই লিখেছিল। প্রতিশোধ নেবার জন্যই কি তাহলে ওর আত্মা আজ এমন করে ওকে বন্দী করেছিল! ভাগ্যিস ওর ধাক্কায় শেষ পর্যন্ত দরজাটা খুলে গেছিল, তা না হলে যে কি হতো!

ছবি: সুফি

শয়তানের জাগরণ

ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

বহু বছর হয়ে গেল, কিন্তু ঘটনাটা এখনো স্মৃতি-পটে পরিষ্কার হয়ে ফুটে আছে। সেই ভয়ংকর দিনটির কথা যখনই মনে পড়ে তখনই আতঙ্কে শিউরে উঠি। এত বছর পরে আজও সেই আতঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পাইনি, বোধহয় কোনোদিন পাবও না। অথচ ঘটনাটা এমনই যে, কেউ সেটা বিশ্বাস করতেই চায় না। ভাবে, আমার বোধহয় ভুল বকার অভ্যেস আছে। কি করে তাদেরকে বোঝাই যে ঘটনাটা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। একজন সাক্ষীও ছিল, কিন্তু সে আর ইহজগতে নেই।

আমি তখন ছিলাম সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপটেন। কিছুদিন আগেই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে একদফা জোর লড়াই হয়ে গেছে। সে লড়াইয়ে আমাদের অপ্রস্তুত সেনাবাহিনীকে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। তাই লড়াই শেষ হওয়ার পরই আমাদের সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা হলো, আর আমাকে পাঠানো হলো সীমান্তের এক সামরিকঘাঁটিতে। ঝড়ের ঠিক পরেই যেমন প্রকৃতি শান্ত হয়ে যায় তেমনি লড়াইয়ের উত্তেজনার পর আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও তখন হয়ে পড়েছিল খুবই নিরুত্তাপ, একঘেয়ে। রুটিন বাঁধা কাজকর্মের পর বাকী সময়টা আমরা সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া গল্পগুজব করে আর তাস খেলেই কাটিয়ে দিতাম। বিশেষতঃ তাস খেলাটা খুবই চলত।

আমি যে ব্যারাকটায় থাকতাম সেটা ছিল বেশ বড়সড়, দোতলা, ঠিক ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো। আশেপাশে কিছুটা দূরে দূরে আরো অনেকগুলো ব্যারাক। ব্যারাকগুলোর সামনে ও পেছনে অনেকখানি ফাঁকা মাঠ, সেখানে আমাদের ড্রিল,প্যারেড, খেলাধুলো এই সব হতো। আমাদের তাসের আসর বসতো একতলার ঠিক মধ্যিখানে একটা বড় ঘরে, যাকে আমরা বলতাম ক্লাবঘর। এই তাসের আসরে সবচাইতে পাকা খেলোয়াড় ছিল আমাদের ব্যারাকের মাইকেল জন। তাসের যে কোনো রকম খেলাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত দেখা যেত সেই জিতেছে। আমাদের ব্যারাকের সব তাসুড়ে তো বটেই, অন্যান্য ব্যারাক থেকে যারা খেলতে আসত, তারাও যে যার পকেট ফাঁকা করেই ফিরত। প্রথম প্রথম কেউ কিছু মনে করেনি, হাসিঠাট্টা করেই ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ততই জনের জেতার বহর বেড়ে চলতে লাগল। ওর অবিশ্বাস্য তাসের হাত আর ভাগ্য নিয়ে শুরু হয়ে গেল ফিসফাস, চাপা গুঞ্জন। একজন তো আবার ওর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে আমাদের জানাল জনের ভাবগতিক মোটেই সুবিধের নয়। বেহিসেবী খরচ করাটা নাকি ওর মজ্জাগত অভ্যেস আর সব সময়েই নাকি ও ধারদেনায় ডুবে থাকে। এসব জানা সত্ত্বেও কিন্তু জনের আড্ডা মারা বা তাসের আসর বসানো বন্ধ হলো না। তার কারণ, জনের চেহারায় আর বাহ্যিক

আচার-ব্যবহারে এমন একটা অমোঘ আকর্ষণ আর সম্মোহনী শক্তি ছিল যে ওকে চট করে কেউ এড়িয়ে যেতে পারত না। মজার মজার গল্প বলে, গান করে মজলিশ জমাতেও জন ছিল সিদ্ধহস্ত। তবে আস্তে আস্তে কিন্তু ওর ওপর সকলের মোহ কেটে যেতে লাগল। অনেকেই নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে, তাস ভাঁজবার সময় ও বিলি করার সময় জন হাতের কায়দায় কিছু তাস সরিয়ে ফেলে। আমাদের মধ্যে কয়েকজন তক্কে তক্কে রইল জনকে হাতেনাতে ধরার জন্য।

ঘটনাটা যেদিন ঘটল, সেদিনটা ছিল রবিবার। সবে শীত পড়তে শুরু করেছে, বেলা ছোট হয়ে এসেছে। সেদিন আমাদের ব্যারাকের মাঠে সারাদিন ধরে খেলাধুলোর আয়োজন করা হয়েছিল। সব অনুষ্ঠান যখন শেষ হলো তখন প্রায় সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। জন একদল বন্ধুবান্ধব নিয়ে সকাল থেকেই ক্লাবঘরে তাসের আসর জমিয়ে বসেছে। আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এসেছিল। তাদের এগিয়ে দিতে গিয়ে গল্প করতে করতে আমিও বেশ খানিকটা চলে গিয়েছিলাম। যখন ফিরে এলাম, তখন অন্ধকার নেমে এসেছে ভালভাবে। আমাদের ব্যারাকের মাঠ একদম ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। গেট দিয়ে ঢুকে হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই দেখলাম ক্লাবঘরের বাইরে একটা জানলার সামনে দীর্ঘদেহী একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার সারা শরীর কালো পোশাকে ঢাকা। মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে কান পেতে ক্লাবঘরের কথাবার্তা একমনে শুনছিল সে। লোকটা আমার সহকর্মীদের মধ্যে কেউ নয়, উপরন্তু ঐরকম পোশাকপরা অত দীর্ঘদেহী লোক আমাদের বা আশেপাশের ব্যারাকে কখনো দেখিছি বলেও মনে হলো না।

ওর হাবভাব দেখে বেশ একটু খট্‌কা লাগল আমার। কোনো সৈনিক ছাউনির একেবারে ভেতরে এরকম একজন অচেনা লোক থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয়। বিপদের আভাস পেয়ে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে ক্লাবঘরে খুব চড়াগলায় তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গিয়েছিল। একাধিক লোক একসঙ্গে চেঁচাচ্ছিল, তাদের মধ্যে জনের গলাই শোনা যাচ্ছিল বেশি। সে যেন খুব উত্তেজিতভাবে কি একটা কথার প্রতিবাদ করে চলেছে। আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ক্যাপটেন মাথুরের গলা কানে এল। সে খুব রাগতভাবে বলছে, 'দেখ জন, বেশি চেঁচিও না। অনেক দিন ধরেই আমাদের সন্দেহ হচ্ছিল যে তুমি তাস হাতসাফাই কর। আজ একেবারে হাতেনাতে ধরেছি। এখুনি তাস দেবার সময় তুমি কড়ে আঙুল দিয়ে প্যাকেটের তলার দিক থেকে তাস টেনেছ, স্বচক্ষে দেখেছি। সবার হাতের তাস গোন। তোমার কাছে একটা তাস নিশ্চয়ই বেশি পাওয়া যাবে। শীগগির তাস দেখাও।'

জন অবশ্য অত কাঁচা ছেলে নয়, সে প্রাণপণে প্রতিবাদ করতে লাগল। কিন্তু দেখা গেল, মাথুরকেই সবাই সমর্থন করছে। তারা সবাই চাইছে যে জনের হাতের তাস পরীক্ষা করে দেখা হোক।

হঠাৎ সকলের মিলিত কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে জনের গলা শোনা গেল। যে ভয়ংকর শপথ সে করল তা লিখতে এখনো আমার কলম কেঁপে যাচ্ছে। সে বলে উঠল, 'শোন সবাই, আমি মোটেই তাস চুরি করিনি। যে কোনো শপথ আমি করতে পারি। যদি আমি তাস সরিয়ে থাকি, তাহলে এখুনি যেন অন্ধকারের রাজা, নরকের প্রভু শয়তান এসে আমাকে চিরদিনের জন্য নিয়ে চলে যায়।'

জনের মুখ থেকে এই কথাগুলো বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ভোজবাজি ঘটে গেল। চমকে উঠে দেখলাম, দীর্ঘদেহী লোকটা এক লাফে খোলা জানালা দিয়ে ক্লাবঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। ভেসে এল জনের তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। তারপরেই একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, আবার সেই দীর্ঘদেহী লোকটা এক লাফে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল। বিস্ফারিত চোখে দেখলাম তার কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় জন ছট্‌ফট্ করছে।

আমি তখনো কিছুটা দূরে ছিলাম। তাড়াতাড়ি পা ফেলে ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই লোকটা একদৌড়ে ব্যারাকবাড়িটার কোণ ফিরে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল। একবার, এক পলকের জন্য ওদের দুজনের মুখটা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। দেখেছিলাম জনের মুখ একদম ফ্যাকাসে। এক অসহ্য যন্ত্রণায় আর আতঙ্কে ওর দুই চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আর দীর্ঘদেহী লোকটার দুই জ্বলন্ত চোখের তীব্র দৃষ্টিতে ফুটে বেরোচ্ছে চরম হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য কি একটা অজানা ভয়ে আমার সারা

আমি মোটেই চুরি করিনি

শরীর অবশ হয়ে গেল। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ওদের ধরব বলে দৌড়লাম। কিন্তু ব্যারাকের বাঁক ঘুরে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই, চারিদিক ফাঁকা, নির্জন।

আবার দৌড়ে ফিরে এলাম সামনের দিকে। গেটের প্রহরীকে চেঁচিয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ এইমাত্র বেরিয়ে গিয়েছে কিনা। সে জানাল, না। অগত্যা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ক্লাবঘরে ফিরে গেলাম।

ভিতরে যে দৃশ্য অপেক্ষা করছিল তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। দেখলাম, যে জনকে মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে দীর্ঘদেহী অচেনা লোকটার কাঁধে ছট্‌ফট্‌ করতে দেখেছি সে সশরীরে ঘরের একটা ইজিচেয়ারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ভাগ্যক্রমে ক্লাবে সেই সময় আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু ছিল, সে পরীক্ষা করে জানাল জন মারা গিয়েছে।

হতবুদ্ধি হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। চোখের সামনে তখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলছে। ঘরের ভেতরে অত লোকের চিৎকার চেঁচামেচি যেন কানে যাচ্ছিল না। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর ঘরে কি ঘটেছে শুনতে চাইলাম। সবাই একসঙ্গে যা বলল, তার সারমর্ম করলে দাঁড়ায়ঃ জন যথারীতি তাস বিলি করার সময় প্যাক থেকে তাস সাফাই করেছিল। ক্যাপ্টেন মাথুর সেটা দেখতে পেয়ে জনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তাই নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি বেধে যায়, যেটা আমি ঘরের বাইরে থেকেই শুনেছি একটু আগে। এই সময় জন হঠাৎ ঐ ভয়ংকর কথাগুলো বলে উঠে। সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বাইরের জানালা দিয়ে একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে টেবিলের তাসগুলোকে উড়িয়ে দেয়। আর জন আর্তচিৎকার করে চেয়ারে ঢলে পড়ে। একটুখানি ছট্‌ফট্‌ করেই তার দেহ স্থির হয়ে যায়।

সব শোনার পর আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরল না। ভাবলাম তাহলে একটু আগে আমি কি দেখেছি আর কেনই বা দেখেছি? যা দেখেছি তা অন্য কাউকে কি বলা যায়? অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত আশেপাশে যারা ছিল, তাদের আমার দেখা ঘটনাটা বলতে গেলাম। ফল হলো বিপরীত, তারা বিশ্বাস তো করলই না উল্টে ভাবল হঠাৎ প্রচণ্ড শক খেয়ে আমার মাথা বোধহয় গোলমাল হয়ে গেছে। আমাকে সুস্থ করার জন্যই তখন আবার কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে আমারও সন্দেহ হতে লাগল, তাহলে কি সবটাই আমার চোখের আর মনের ভুল!

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্যাপটেন ভার্গব কখন একসময় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। ক্লাবঘরের ঠিক ওপরের কামরাটাতেই থাকত ও। শরীরটা বেশ কিছুদিন ধরে খারাপ যাচ্ছিল বলে সারাদিন ভার্গব ওপর থেকে নামেনি। আমার কথা শুনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে জিজ্ঞেস করল, 'চৌধুরী তুমি দেখেছ? জনের জন্যে যে অপেক্ষা করছিল, তাকে দেখতে পেয়েছ তাহলে?'

ভার্গবের কথা শুনে এই চরম বিভ্রান্তির মধ্যে যেন অকূলে কূল খুঁজে পেলাম। যাক তাহলে আমি পাগল হয়ে যাইনি, ভুলও দেখিনি। ভার্গব দোতলার ঘরের জানালাতেই বসেছিল। রহস্যময় দীর্ঘদেহীকে সেও ভালভাবেই লক্ষ্য করেছে। কোন এক অদৃশ্য শক্তির বিচিত্র খেয়ালে আমরা দুজনই ক্ষণিকের জন্যে অতিপ্রাকৃত কিছু একটা দেখতে পেয়েছি। তার ফলে যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল তার অভিশাপ থেকে সারা জীবনেও মুক্তি পেলাম না।

আমাদের দুজনের মুখে হুবহু একই ঘটনার বর্ণনা শুনে ব্যারাকের অন্যান্য লোকেরা প্রথমে একটু থমকে গিয়েছিল। কেউ কেউ ভয়ও পেয়েছিল, কিন্তু বেশির ভাগ সহকর্মীই আমাদের পাগল আর মিথ্যেবাদী বলে বিদ্রূপ করেছিল।

যাই হোক, এরপর থেকে ব্যারাকে তাস খেলা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ঐ দিনের ঘটনা নিয়ে কেউ খোলাখুলিভাবে আলোচনাও করতো না। তবে চাপা গুঞ্জন তল্লাটের সব কটা ব্যারাকেই চলত। আমাকে আর ভার্গবকেও সবাই যেন এড়িয়ে যেতে লাগল। ভার্গব অবশ্য এর অল্প কয়েকদিন পরেই এক জিপ দুর্ঘটনায় মারা যায়। কিন্তু আমি এখনো বেঁচে আছি, আর সেদিনের দুঃসহ স্মৃতির বোঝা বয়ে চলেছি। এখনো মাঝে মাঝে সেই ভয়াবহ দৃশ্যটি স্বপ্নে দেখে ঘুম ভেঙে যায় আর আতঙ্কে হিম হয়ে উঠে বসে বিনিদ্র রজনী কাটাই।

ছবি : ধ্রুব রায়

মুখোপাধ্যায় • মান্না • দত্ত
উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান
(হায়ার সেকেন্ডারী • জয়েন্ট এন্ট্রান্স • সর্বভারতীয় বায়োলজী পরীক্ষার্থীদের জন্য যুগোপযোগী গ্রন্থ)
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় • বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
(প্রশ্নোত্তরে)
সংসদের নমুনা প্রশ্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসা প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত নমুনা কপি না পেয়ে থাকলে সরাসরি লিখুন
নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩

গাজোলের পীরবাবা

পোপো মুখোপাধ্যায়

আমার আর তখন পিছোবার জায়গা নেই। দেওয়ালে একেবারে পিঠ ঠেকে গেছে। এক পা এক পা করে এগোতে এগোতে কালো আলখাল্লা পরা সেই বিশাল মূর্তিটা তখন আমার এক হাতের মধ্যে এসে গেছে। তার গরম নিঃশ্বাস আমার গায়ে লাগছে। চোখ দুটো ভাঁটার মতন ঘুরছে। তার মাথা প্রায় ছাদে ঠেকেছে। মুখ দিয়ে ক্রমাগত লালা ঝরছে। মাঝে মাঝে হাঁ করছে। দাঁতগুলো ধারালো ছুরির মতো চকচক করছে। আর এক পা এগোলেই আমাকে ধরতে পারবে। আমার সমস্ত স্নায়ু যেন অবশ হয়ে এল। পালাবার রাস্তা নেই এটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই হৃৎপিণ্ডটা যেন বুকের খাঁচার ওপর দমাদম ঘা মারছিল। একটা ঠাণ্ডা শিরশিরানি সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে গেল। এবার আমার শেষ।

এই পর্যন্ত বলেই আমি থামলাম। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো স্বর চিৎকার করে উঠল, তারপর? তারপর কি হলো? তুমি বাঁচলে কেমন করে? তারপর মূর্তিটা কি করল?

আমি চোখ বুজে চায়ে একচুমুক দিয়ে বললাম, দাঁড়া যা টেনশন, আমারই গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু গলা ভিজিয়ে নিই।

এবার ছোটদের সঙ্গে বড়রাও গলা মেলাল। আমার মাসতুতো দাদা তুষারদা বলল, তুই একেবারে মোক্ষম জায়গায় থামলি। এমন ক্ল্যাইম্যাক্সে পৌঁছে কেউ থামে?

আমি হেসে বললাম, ঐটাই তো আসল। কখন থামতে হবে এটা বড় লেখক আর বড় ওস্তাদ ছাড়া কেউ জানে না। তোমাদের আগ্রহটা ধরে না রাখতে পারলে আমার গল্প বলাই খতম।

এমন সময় মাসিমা ঢুকলেন। মিলিটারী অফিসারের মতো কড়া নির্দেশ দিয়ে বললেন, অনেক রাত হয়েছে, খাবার টেবিলে চলে যাও। খেতে খেতে গল্প হবে।

অগত্যা গুটিগুটি সবাই গিয়ে বসলাম খাবার টেবিল ঘিরে।

এই ফাঁকে যারা প্রথমের অংশটুকু থেকে বাদ পড়েছ, তাদের ছোট করে গল্পের মুখটা ধরিয়ে দিই। গল্প নয় ঠিক, আমার

জীবনের সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা।

ঘটনাটা ঘটেছিল গতবছর শীতকালে মানে ডিসেম্বর মাসে। জায়গাটার নাম গাজোল। মালদা থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। বাসের যোগাযোগ ভালই আছে। একদম গ্রাম এবং মুসলমান প্রধান। সেই গ্রামে এক মস্ত সাধক আছেন। তিনি পীরবাবা নামে খ্যাত। গোটা উত্তরবঙ্গে সবাই একডাকে চেনে। পীরবাবা অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী। কোনো শনিবার অমাবস্যা পেলে তিনি সারারাত কঠিন সাধনায় বসেন। সেই সময় তাঁর ওপর জিনের ভর হয়। ভরের মুখে তিনি অনেকের ভূতভবিষ্যৎ বলে দেন। গতবছর মালদায় দাদার মেয়ের অন্নপ্রাশনে গিয়ে এই খবরটা প্রথম আমার কানে আসে। দাদার ভায়রাভাই দিলীপদা পীরবাবার বিরাট ভক্ত। তাঁর ধারণা তিনি যা কিছু করেছেন মানে ব্যবসা-গাড়ি-বাড়ি সব কিছু ঐ পীরবাবার জন্যে। আমার আবার ও সবে একদম বিশ্বাস নেই। তাই দিলীপদার মুখে ওঁর কথা শুনেই আমি লাফিয়ে উঠলাম যাব বলে। দিলীপদা প্রথমে রাজী হননি, তারপর জেদাজেদি করতে নিমরাজী হলেন। ঠিক হলো আমি, দিলীপদা আর বৌদি যাব। তবে দিলীপদা প্রথমেই আমাকে সাবধান করে দিলেন, বললেন, দেখ তুই বলছিস বলে আমি নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু গিয়ে বাবাকে যেন কোনোরকম পরীক্ষাটরীক্ষা করতে যাস না। তাহলে কিন্তু নিজের বিপদ ডেকে আনবি।

আমি বললাম, আরে না না আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। আমি যথেষ্ট ভক্তি নিয়েই যাব। শুধু দেখব ভূত বা জিন উনি কিভাবে নিয়ে আসেন। তার সঙ্গে যদি উপরিপাওনা হিসেবে নিজের ভবিষ্যৎটা জানা যায় তবে মন্দ কি।

আমরা প্ল্যানমতো শনিবার রাত আটটার সময়ে স্টার্ট করলাম। দিলীপদা আর বৌদি সারাদিন উপোস করেছেন। ওখানে নাকি এই নিয়ম। আমি অবশ্য ওদিকে যাইনি। শরীরকে কষ্ট দিয়ে কিছু করা আমার ধাতে সয় না।

বেরুবার সময়ে বৌদি দেখি প্রচুর ফুল বেলপাতা বোঝাই একটা সাজি সঙ্গে নিয়েছেন। আমি আর কি নেব। গলায় ঝোলান ক্রশটা মাথায় ঠেকিয়ে নিলাম। পকেটে নিলাম বিদেশী চার্জার টর্চটা।

গাড়িতে সময় বেশিক্ষণ লাগল না। ন-টার মধ্যে ওখানে পৌঁছে গেলাম। একদম গ্রাম, অধিকাংশ মাটির বাড়ি। আমরা যে বাড়িটার সামনে গিয়ে নামলাম সেটাও মাটির, তবে মাথাটা টিন দিয়ে ঢাকা। সামনে অনেকটা উঠোন। একে শীতকাল, তার ওপরে অমাবস্যা। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। বারান্দায় একটা টিমটিমে আলো জ্বলছিল। আমরা সেইদিকে এগোলাম। কাছে গিয়ে দেখি দুজন পুরুষ ও একজন মহিলা চাদর ঢাকা দিয়ে একটা হ্যারিকেনের পাশে বসে আছে। কারুরই মুখ দেখা যাচ্ছে না। একটা কালো কুকুর পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। বাবার কথা জিজ্ঞেসা করতে ওরা আমাদের বসতে বলল। বৌদি আর দিলীপদা ওখানেই বসে পড়লেন। আমি বসলাম না, বাড়িটার চারিদিক ঘুরে দেখতে লাগলাম।

মাটির বাড়ি হলেও বেশ শক্ত। পিছনদিকে অনেক বড় বড় পাথর ফেলা আছে, কি জন্যে কে জানে! আমি পিছনদিকে একটা দরজাটরজা থাকবে আশা করেছিলাম। কিন্তু সে সব কিছুই নেই। সামনের ঐ একটা দরজাই সম্বল। আমি পিছনদিকে প্রতি ইঞ্চি জায়গা টর্চ দিয়ে তন্নতন্ন করে দেখছিলাম। পাশেই একটা বেলগাছ। তার ডালে উঠে ছাদে উঁকি মারলাম। কোনো কিছুই নেই। আমি হতাশ হয়ে যখন সামনের দিকে চলে আসব ভাবছি, হঠাৎ দেখি একটা কালো মোটা লোক, চাদরে মুখ অর্ধেক ঢাকা আমার সামনে হাজির। আমি দারুণ চমকে গেছি। লোকটা ঠাণ্ডা গলায় বলল, এখানে কি করছেন? এদিকে আসা বারণ আছে জানেন না?

আমি বললাম, এখানে বাথরুম নেই কোনো?

লোকটি একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, ঐ দিকে চলে যান। এদিকে আর আসবেন না। বিপদ হতে পারে।

কোনো কথা না বলে আমি সামনে চলে এলাম, তবে লোকটাকে আর দেখতে পেলাম না।

সামনে আসতেই দিলীপদা বললেন, কোথায় গিয়েছিলি, এ দিকে সময় হয়ে গেছে। ভেতরে চ'।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ঢোকার মুখে দেখি সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে বলল, আপনাদের কারো কাছে টর্চ নেই তো। থাকলে দিয়ে যান। ওখানে কোনো আলো জ্বালা চলবে না।

আমি টর্চ জমা না দিয়েই ভেতরে ঢুকে গেলাম। ঢোকার মুখটা খুবই সরু। একজন করে লোক ঢুকতে পারে। তবে ঘরটা অনেকটা বড়। একদিকে টিমটিম করে একটা প্রদীপ জ্বলছে। যতটুকু না আলো দিচ্ছে তার চেয়ে বেশি ছায়া। সেই আলোয় দেখলাম এক কোণে পীরবাবা বসে আছেন একটা বাঘছালের আসনে। কালো আলখাল্লা পরা বিশাল চেহারা। সাদা দাড়ি অনেকটা ঝুলছে। মাথায় টাক, দু চোখ বোজা, গলায় পুঁতির মালা। মালা জপ করছেন।

একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে মালা মাটিতে ঠক করে ঠেকাচ্ছেন। ঐ আওয়াজটা যেন ঘরে প্রতিধ্বনিত হয়ে অনেকগুণ হয়ে আমাদের কানে বাজছে।

আমরা ছাড়াও ঘরে আরো দর্শনার্থী ছিল। বেশির ভাগই মহিলা। সবই গ্রামের দিকের। সবাইয়ের হাতেই ফুলের ডালা, মিষ্টির বাক্স। আমরা শহর থেকে এসেছি বলে বোধহয় আমাদের সামনের জায়গাটা ছেড়ে দিল। আমরা মাটিতে বসলাম। মাটির মেঝে খুব ঠাণ্ডা।

আমি একটু পরেই উঠে দাঁড়ালাম। কবজি উলটে দেখলাম রাত সাড়ে বারোটা। তার মানে এখনো আধঘণ্টা। বাবার নাকি ভর হয় ঠিক একটার সময়ে। গ্রাম বলে বোধহয় চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। সবাই একদৃষ্টে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি পিছন ফিরে সেই লোকটাকে খোঁজার চেষ্টা করলাম। দরজায় এখন আর সে নেই। দরজাটা বন্ধ।

বাবার পেছনদিকে বিরাট ছায়াটা দুলছে। একদৃষ্টে তা দেখতে দেখতে আমার বোধহয় একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠলাম। সোঁ সোঁ শব্দ করে বিশাল একটা কিছু বাড়ির চালায় এসে বসল মনে হলো। চালাটা মড়মড় করে উঠল। নিমেষের মধ্যে দেখি পীরবাবার দেহটা আরো লম্বা ও বড় হয়ে গেছে। মাথাটা প্রায় ছাদে ঠেকছে। চোখের মণিগুলো যেন বড্ড চকচক করছে। পাশ থেকে একজন বলল, বাবার ভর হয়েছে, আপনাদের যা প্রশ্ন করার করুন।

সবাই প্রণাম করে একে একে নিজের প্রশ্ন করতে লাগল। একটা খুব ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরে দূর থেকে উত্তরগুলো ভেসে আসছিল। আওয়াজটা ঠিক যান্ত্রিক নয় আবার মানুষের গলাও নয়। কেমন অপার্থিব যেন। গায়ে কাঁটা দেয়। হঠাৎ সেই আওয়াজটা থেমে গেল। তার বদলে একটা বীভৎস স্বর ভেসে এল। সে স্বর আমি কোনোদিন ভুলব না। অতিবড় সাহসীরও প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায় সে স্বর শুনলে। সেই কণ্ঠস্বর বলল, আমাকে বারবার কষ্ট দিয়ে ধরে নিয়ে আসা—একবার যদি সুযোগ পাই তাহলে তোকে চিবিয়ে খাব।

পরমুহূর্তে একটা ঝটপট আওয়াজ কানে গেল। তারপরই দেখলাম পীরবাবা আবার নিজের আসনে বসে। দিলীপদা বললেন, বাবার নাকি রাতে দু তিনবার ভর হয়। আবার ভর হতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরি হবে। আমি ভাবলাম এই ফাঁকে একটু বাইরে ঘুরে আসি। কিন্তু দরজার কাছে এসে দেখি তখনো তা বন্ধ। ওধার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একজন বলল, একবার ঢুকলে ভর শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাইরে যাওয়া যাবে না। আমি আবার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এবার কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। প্রায় আধঘণ্টার মধ্যেই সেই আগের মতো ব্যাপার আরম্ভ হলো। এবার বাড়িটা এত জোরে কেঁপে উঠল যে মনে হলো ছাদ বুঝি ভেঙে পড়বে। সবে দু'একজন বাবাকে প্রশ্ন করেছে হঠাৎ ঘরের ভেতরেই ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। অবাক হয়ে ভাবলাম দরজা তো বন্ধ তবে এত হাওয়া আসছে কোথা থেকে? পীরবাবা মনে হলো টলছেন। টলতে টলতে ওঁর হাত থেকে সেই পুঁতির মালা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। পরক্ষণেই হি-হি করে এক হিমশীতল হাসির শব্দ আর তারপরই মনুষ্যকণ্ঠের বীভৎস চিৎকার। সারা ঘরে যেন তাণ্ডব চলছে।

আলোটা আগেই নিভে গিয়েছিল। সামনে প্রচণ্ড ঝটপটানি হচ্ছে বুঝতে পারছি, কিন্তু কিছুই দেখতে পারছি না। ভয়ে সবাই এ ওকে জাপটে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ আমার মনে হলো পকেটেই তো টর্চটা আছে। তাড়াতাড়ি সেটা বের করে জ্বালিয়ে সামনে ফেললাম। যা দেখলাম তাতে শিউরে উঠলাম। পীরবাবা মাটিতে শুয়ে আছেন আর তাঁর বুকের ওপর একটা কালো রঙের ভয়ঙ্কর মূর্তি। পীরবাবা প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। সেই মূর্তিটা দাঁত দিয়ে ওঁর গলার কাছটা কামড়াবার চেষ্টা করছে।

আমি টর্চ জ্বেলে এক পা এগোতেই সেই মূর্তিটা উঠে দাঁড়াল। আমি টর্চ জ্বেলেই আছি। সেই বিরাট মূর্তিটা এক পা এক পা

এদিকে আর আসবেন না।

করে এগোতে লাগল। আমি পিছোতে পিছোতে দেওয়ালে আটকে গেলাম। আমি ওর চোখের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছি না। বেশ বুঝতে পারছি, একটা কিছু না করলে ওটা আমাকে মেরে ফেলবে। পীরবাবার মন্ত্রপূত মালাটা যে কোথায় ছিটকে গেছে কে জানে। ওটা পেলেও ঠেকান যেত, কিছু না পেয়ে আমি আমার শেষ সম্বল ক্রশটা গলা থেকে খুলে সামনে বাগিয়ে ধরলাম। মূর্তিটা থমকে গেল। তারপর এক পা এক পা করে পিছোতে লাগল। ঠিক এই সময় আমার অবশ হাত থেকে টর্চটা মাটিতে পড়ে গিয়ে ঘরের ভেতরটা অন্ধকারে ডুবিয়ে দিল। সেই অন্ধকারে অনুভব করলাম, বাড়িটা একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। তারপর সব নিস্তব্ধ। আমার গা দিয়ে তখন দরদর করে ঘাম ঝরছে। ছুটে দরজার কাছে এসে এক হ্যাঁচকা টান মারলাম। দরজা খুলে গেল। আমি দিলীপদা আর বৌদিকে নিয়ে ছুটে বেরুলাম। তারপর কি ভাবে যে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি আমার কিছুই মনে নেই।

এই পর্যন্ত বলে দম নিতে আমি একটু থামি। টেবিলের চারধারে একবার চোখ ঘুরিয়েনি। কারো মুখে রা-টি নেই, সবাই হাঁ করে আমার কথা গিলছে। আমি আবার শুরু করি—

দুদিন আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। ঐ বীভৎস মূর্তিটা বারবার আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াত। ওটা যে কি, জিন না প্রেত, তা জানি না। আর পীরবাবা যে কিভাবে ওকে নিয়ে আসতেন তাও বুঝতে পারিনি। তবে পীরবাবার জীবন যে একদিন ওদের হাতেই শেষ হবে তা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিলাম।

খাওয়া আমার হয়ে গিয়েছিল। তাই উঠতে উঠতে বললাম, জানি, আধুনিক বিজ্ঞান এটা নিশ্চয় মেনে নেবে না, তবে বুদ্ধিতে সব কিছুর কি ব্যাখ্যা চলে?

ছবি: ধ্রুব রায়

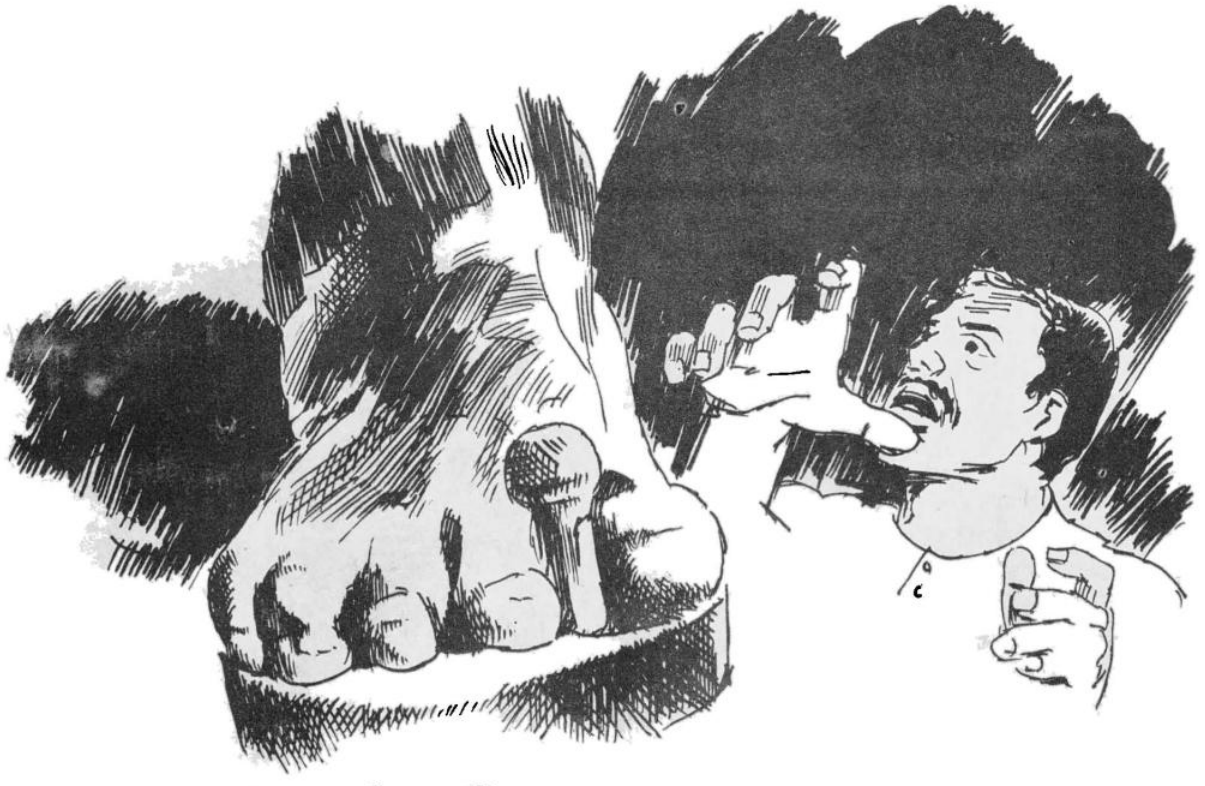

সেই দু'খানি পা

বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শুরুতেই জানিয়ে রাখি, ঘটনাটা আমার স্বচক্ষে দেখা নয়, শোনা। এ ঘটনা আমি যার কাছে জেনেছিলাম, তিনি নিজেই ছিলেন এ কাহিনীর এক অন্যতম চরিত্র। সত্য, মিতভাষী ও পরোপকারী এই মানুষটির প্রকৃত নাম আমি গোপন রাখছি। শুধু তোমাদের সামনে অবিকল তুলে ধরছি ভয়ংকর সেই কাহিনী।

সাল ১৯৪৭। সারা ভারতবর্ষে তখনও লুঠতরাজ, '৪৬-এর দাঙ্গা-হাঙ্গামার জের চলছে। দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজজীবন টালমাটাল। এমনই এক সময়ে, আলোচ্য কাহিনীর বক্তা ভদ্রলোক, নাম সত্যেশ্বর, আসাম যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য, সার্ভেয়ার হিসাবে পুরনো রেকর্ডপত্র ঘেঁটে দেশবিভাগের পর আসামের কতটুকু ভারতে থাকবে আর কতটুকু পাকিস্তানে থাকবে বস্তুত, তাঁর রিপোর্টের উপর নির্ভর করেই ইংরেজ সরকার আসামে সীমানা স্থির করবেন।

গৌহাটি স্টেশন থেকে সোজা সার্ভে অফিসে গিয়ে দেখা করলেন সত্যেশ্বর সার্ভে অফিসে ছোটখাট কাজ সারতে সারতে দেখলেন রাত হয়ে গেছে। অথচ রাতে কোথায় থাকবেন সি সত্যেশ্বরবাবু হোটেলের খোঁজ করছেন, এমন সময় তাঁরই অফিসের এক বিহারী পিওন শুকরাম জানাল যে, তাদের বাড়িতে সত্যেশ্বরের থাকবার মতো একখানা ঘরের ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। ঘটনাচক্রে শুকরামদের বাড়িতে সে রাতে আশ্রয় পেয়ে সত্যেশ্বর নিঃসন্দেহে আশ্বস্ত হলেন। শত হলেও গৃহস্থ বাড়ির আপ্যায়ন আর মফস্বলের হোটেলের অভ্যর্থনার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে।

তা সত্যিই শুকরামের বাড়িতে সে রাতে ভাল আপ্যায়নই পেলেন তিনি। শুকরামের স্ত্রী পর্দানসীন অর্থাৎ বাইরের পুরুষ মানুষের সামনে বেরোয় না। কিন্তু তার দুই মেয়ে পূর্ণিমা আর সরসতিয়া, দুজনেরই বয়স বারো থেকে চোদ্দর মধ্যে, তাঁকে খুব যত্ন করল। গাওয়া ঘি, পটল ভাজা, মুগ ডাল আর আচার দিয়ে হাতে গড়া রুটি গোটা দশেক খেয়ে ফেললেন সত্যেশ্বর। খাওয়ার সময় তাঁর পাশে বসে সরসতিয়া হাওয়া করতে লাগল। আর পূর্ণিমা নিল পরিবেশনের ভার। খাওয়ার পাট চুকলে সত্যেশ্বর একটু লজ্জিত কণ্ঠে জানালেন, তাঁর এত বেশি খাওয়াটা উচিত হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে প্রতিবাদ জানাল শুকরাম আর তার দুই মেয়ে। মনে হলো অন্তঃপুর থেকে তার গৃহিণীও তাদের সমর্থন জানাল তিনি অতিথি, হয়তো শুকরামদেরই যত্নের ত্রুটি হয়ে গেছে।

আঁচিয়ে ওঠবার পর পূর্ণিমা এক খিলি পান সেজে আনল। শুকরামের বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। হ্যারিকেনই ভরসা। এমন সময় উঠোনে কার গলার আওয়াজ পেয়ে সবাই হঠাৎ

চমকে উঠল। শুকরাম হ্যারিকেন হাতে বাইরে এসে দেখল সার্ভে অফিসের সত্যেশ্বরবাবুর সহকর্মী শেখ মহিউদ্দিন উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন। যদিও হিন্দু মুসলমানের বিভেদ সে সময়ে সমাজকে বিষাক্ত করে তুলেছিল, কিন্তু সরকারী অফিসের কর্মীদের মধ্যে সেটা বিদ্যমান ছিল না। এত রাতে আর একজন সহকর্মী তাঁর খোঁজ নিতে এসেছেন দেখে সত্যেশ্বর খুশি হলেন। তিনি শেখ-সাহেবকে ডেকে এনে ঘরের মধ্যে বসালেন।

শেখ সাহেবের বয়স ষাট ছাড়িয়েছে। মুখে সাদা লম্বা দাড়ি, আর চোখে কালো ফ্রেমের চশমা তাঁকে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। কথা তিনি বলেন কম শোনেন বেশি। দেশের রাজনীতি, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে তাঁদের আলোচনা দেখতে দেখতে বেশ জমে উঠল।

রাত যখন প্রায় সাড়ে দশটা পূর্ণিমা এল সত্যেশ্বরবাবুকে শুতে ডাকতে। শেখসাহেব যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। পূর্ণিমার পিছন পিছন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট শোবার ঘরটির দিকে চললেন সত্যেশ্বর। তবে কিছু দূর গিয়ে তাঁর খেয়াল হলো বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় শেখসাহেবের কাছে বিদায় নেওয়া হয়নি। তিনি পূর্ণিমাকে দাঁড়াতে বলে আবার ফিরে এলেন বৈঠকখানায়। কিন্তু সেখানে তখন শুকরাম ছাড়া আর কেউ ছিল না। সত্যেশ্বরবাবুকে ফিরে আসতে দেখে শুকরাম যেন আঁতকে উঠল। 'কি হয়েছে দাসবাবু?'

সত্যেশ্বর শুকরামকে চমকাতে দেখে অত্যন্ত অবাক হলেন, তবু সে ভাব গোপন রেখে বললেন,'শেখসাহেব কি চলে গেছেন?'

শুকরাম মাথা নাড়ল, 'হাঁ, এইমাত্র চলে গেলেন।'

সত্যেশ্বর অগত্যা আবার ফিরে চললেন। পূর্ণিমার কাছে পৌঁছতেই সে দূর থেকে তাঁর ঘরটি দেখিয়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। সত্যেশ্বরও নীরবে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। সবে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছেন তিনি এমন সময় খপ করে কে যেন তাঁর হাত চেপে ধরল। ভয়ে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন সত্যেশ্বর, সেই ছায়ামূর্তি ইশারায় তাঁকে শব্দ করতে বারণ করল। আকাশে তৃতীয়ার মরা চাঁদ, তারই আলোয় সত্যেশ্বর দেখেন হাত ধরে আছেন শেখসাহেব।

ফিসফিস করে শেখসাহেব বললেন, 'দাসবাবু, আমি আপনার জন্যই চলে যেতে পারিনি। আপনি এই মোড়কটা আপনার কাছে রাখুন।' বলে শেখসাহেব তাঁর প্রিন্স কোটের পকেট থেকে একটা বড় সাদা মোড়ক বের করে সত্যেশ্বরের হাতে দিলেন। বললেন, 'রাত্রে একবারের জন্যও এটা হাত ছাড়া করবেন না। খবর্দার, তাহলে কিন্তু ভীষণ বিপদ উপস্থিত হবে।'

সত্যেশ্বর ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, তবু কৌতূহল যায় না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কথা বলছেন কেন শেখসাহেব?

শেখসাহেব তেমনি ফিসফিস করে বললেন, 'বলবার সময় নেই, কিন্তু এটা হারাবেন না। ভীষণ বিপদ। খুদা হাফিজ।'

শেখসাহেব অদৃশ্য হলেন। তাঁর দেওয়া সাদা কাগজে মোড়া

আপনি কি হারাচ্ছেন
জানেন কি?

গ্রাহকদের জন্যে
বিশেষ সুযোগ

এক বছরের

পুজো সংখ্যা সহ ১২টি সংখ্যা হাতে নিলে ১২২ টাকার বদলে মাত্র ৯০ টাকা বুক পোস্টে ১১০ টাকা রেজিঃ পোস্টে ১৭০ টাকা।

দু বছরের

দুটি পুজো সংখ্যা সহ ২৪টি সংখ্যা হাতে নিলে ২৪৪ টাকার বদলে মাত্র ১৭০ টাকা বুক পোস্টে ২১০ টাকা রেজিঃ পোস্টে ৩৩০ টাকা।

তিন বছরের

তিনটি পুজো সংখ্যা সহ ৩৬টি সংখ্যা হাতে নিলে ৩৬৬ টাকার বদলে মাত্র ২৫০ টাকা। বুক পোস্টে ৩১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৪৯০ টাকা।

গ্রাহকদের জন্যে এই বিশেষ সুযোগ নিতে হলে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখে নিচের ঠিকানায় এম ও করুন। চেক ও ড্রাফটেও টাকা পাঠাতে পারেন। বাংলার বাইরের ব্যাঙ্কের চেক হলে ২০ টাকা বেশি লাগবে। 'শুকতারার জন্য' কথাটি পরিষ্কার করে লিখে দেবেন।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

এই মোড়কটা আপনার কাছে রাখুন

চৌকো বস্তুটা হাতে নিয়ে সত্যেশ্বর ঢুকলেন শোবার ঘরে।

ঘরটি মাটির। বিছানা করা আছে পরিপাটিভাবে, মায় মশারিটি পর্যন্ত টাঙানো আছে। একটি ছোটো টুলের উপর কুঁজো আর গ্লাস। সত্যেশ্বর পাঞ্জাবি খুলে সরিয়ে রাখলেন। তারপর এক গ্লাস জল খেঁয়ে শুতে যাবেন, তাঁর মনে পড়ল মোড়কটার কথা, শেখসাহেব যেটাকে হাতছাড়া করতে নিষেধ করেছিলেন। তাড়াতাড়ি সেটাকে পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে কোমরের ঘুনসিতে রেখে দিলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন।

ক্লান্ত চোখে ঘুম নামতে বিলম্ব হলো না। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন জানেন না, হঠাৎ একটা খট খট শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। প্রথমটা কোথা থেকে শব্দটা আসছে বুঝতে চাইলেন তিনি। এদিক ওদিকে ভালোভাবে নজর করে ঘরের মেঝের দিকে চাইতেই আঁতকে উঠলেন। হ্যারিকেনটা এক পাশে কমান ছিল। তার স্তিমিত আলোয় দেখেন এক জোড়া খড়ম-পরা পা অত্যন্ত দ্রুত ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পায়চারি করছে। পায়ের উপরে মানুষের অবয়ব খুঁজতে গিয়ে সত্যেশ্বরের বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গেল। কারণ সেখানে কোনো মানুষের দেহ ছিল না।

কোনো দুর্বল হৃৎপিণ্ডের মানুষ মারা পড়ত সেই মুহূর্তেই, কিন্তু সত্যেশ্বর একেবারে দুর্বল ছিলেন না। তাছাড়া তাঁর মনে হলো একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁকে সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ের তখনও আরও বাকী ছিল। হঠাৎ তিনি দেখলেন খড়ম-পরা পা জোড়া ঠিক তাঁর খাটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর সেই পা জোড়ার একটা পা উপরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটাও উঠে এল। অর্থাৎ পা জোড়া তখন সত্যেশ্বরবাবুর বালিশের পাশে। ক্রমে ধীরে ধীরে পা দুটো তাঁর গলার দিকে এগিয়ে এল।

আবার সত্যেশ্বর অনুভব করলেন একটা অদৃশ্য শক্তির প্রবাহ যেন তাঁর শরীর বেয়ে উঠে আসছে। এক আসুরিক শক্তিতে তিনি খাট থেকে মশারি তুলে লাফিয়ে নেমে এক দৌড়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর সমস্ত দেহ তখন ঘামে ভিজে জব-জব করছে। মনে হচ্ছে সেই এক রাতেই যেন তাঁর পরমায়ু অর্ধেক কমে গেছে। অত রাত্রে শুকরামের বাড়ির অন্যান্য ঘরের দরজা বন্ধ। টলমল পায়ে কোনো রকমে শুকরামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আচ্ছন্নের মতো তিনি বড় রাস্তায় এসে বসলেন।

পরদিন সকালে সবার আগে দেখা হলো সরসতিয়ার সঙ্গে। সরসতিয়া তাঁকে দেখে যেন চমকে উঠল। কিন্তু সত্যেশ্বর মেয়েটির দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে চাইলেন না। তিনি শুকরামের অপেক্ষায় ছিলেন। এক সময় শুকরাম বেরিয়ে এল। সত্যেশ্বর মুখে কোনো কথা না বলে সোজা শুকরামের ফতুয়ার বুকের কাছটা মুঠো পাকিয়ে ধরলেন। আর আশ্চর্যের ব্যাপার শুকরাম শিশুর মতো শব্দ করে কেঁদে উঠল।

সত্যেশ্বর কঠিন স্বরে জানতে চাইলেন, 'ওই ঘরের মধ্যে কাকে পুষে রেখেছিস বল?'

শুকরাম কাঁদছিল। কাঁদছিল তার মেয়েরাও। শুকরাম বলল, 'পারি না সাহেব, ভয়ে কিছু করতে পারি না। উনি ছিলেন আমার ঠাকুর্দা। প্রতিবছর স্বপ্নে নতুন নতুন মানুষ নিয়ে আসবার আদেশ দেন। ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে ওঁর শরীরটা থেঁৎলে গিয়েছিল। অক্ষত ছিল শুধু পা দুটো। আপনার আগে ওই ঘরে আরও সাত আটজন ভয় পেয়ে মারা গেছে। ওটা ছিল ঠাকুর্দার ঘর। আমি গয়ায় পিণ্ড দিতে চাই, কিন্তু বাড়িতে তিনটে মেয়েকে রেখে গয়া যেতে সাহস পাই না। এমন কাউকে পাইনি যারা গয়া যাবে।'

সত্যেশ্বর এখন অন্য মানুষ। গর্জন করে উঠলেন, 'তা বলে তুই নির্দোষ মানুষগুলিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবি? আমি যাব গয়ায়। বল তোর ঠাকুর্দার নাম।'

দিনের আলোতে সেই ঘর থেকে নিজের পাঞ্জাবিটা নিয়ে এলেন সত্যেশ্বর। সেই দিনই রওনা হয়েছিলেন গয়ায়। প্রেত-শিলায় পিণ্ডদান করেছিলেন। সেদিন সেই অভিশপ্ত ঘর থেকে পাঞ্জাবি নিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় ঘরের দেওয়ালে দেখেছিলেন একখানা বিবর্ণ ছবি। এক শুষ্ক চেহারার বৃদ্ধের। আরক্ত চোখ দুটিতে রাগত ভাব। আর বৃদ্ধের পা! পায়ের দিকে তাকিয়ে আবার বুক হিম হয়ে গিয়েছিল তাঁর। মনে হয়েছিল ছবিটা বুঝি জীবন্ত। সে ছবি ঘরের মধ্যেই পুড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন তিনি।

শেখসাহেবকে পরে সব ঘটনা জানাতে তিনি গম্ভীর হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যখনই আর এক পিওন বৈকুণ্ঠের মুখে শুনলাম যে শুকরাম আপনাকে ওর বাড়িতে নিয়ে গেছে, তখনই বিপদের আশঙ্কা করেছিলাম। ওই সাদা মোড়কটা আমার এক শ্রদ্ধেয় পীরবাবার তাবিজ।'

যাই হোক, এ ঘটনার কিছুদিন পরে শুকরাম ওই বাড়ি ছেড়ে, চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে যায়। আর পিণ্ডদানের পর সে ঘরের বদনামও আর সত্যেশ্বর শোনেননি।

চেনাশোনা ভূত

রবিদাস সাহারায়

হাবুল নন্দী এক্সপেরিমেন্ট মাস্টার। সে বেড়ালের বাচ্চাকে কুকুরের ডাক এবং কুকুরের বাচ্চাকে বেড়ালের ডাক শেখাবার জন্য বেশ কিছুদিন ধরে গবেষণা করে আসছে। তার যুক্তিও খুব জোরালো। মানবশিশুরা ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে থাকে সেই ভাষাই তারা শিখে নেয়। তারা তো আর মাতৃভাষা শিখে জন্মায় না। যে ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে তারা থাকে সে ভাষাই হয় তাদের কথ্য ভাষা। কাজেই জন্মের পরই যদি কুকুরের বাচ্চা বেড়ালের বাচ্চার সঙ্গে থাকে তবে বেড়ালের ডাকই সে ডাকতে শিখবে। বেড়ালের বাচ্চা কুকুরের সঙ্গে থাকলে শিখবে কুকুরের ডাক।

দুঃখের বিষয়, এই গবেষণায় সে সফল হতে পারেনি। কারণ দেখা গেছে কুকুরছানা আর বিড়ালছানা তাদের বিপরীত ভাষা শেখবার আগেই আশ্চর্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়েছে।

শাগরেদ গদাইকে হাবুল বলল, তুই একটা হোপলেস। কোনো রহস্যের সমাধানই তোকে দিয়ে হয় না। তাই এমন একখানা এক্সপিরিমেন্টও বানচাল হয়ে গেল।

গদাই বলল, হাবুলদা, কুকুর বেড়াল নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে একটা তোতাপাখি নিয়ে মাথা ঘামালে এতদিনে মানুষের মতো কথা বলতে শিখে যেত। আমাদেরও বাণিজ্য হয়ে যেত কিছু।

—কি রকম?

—তোতাপাখির কথা শুনিয়ে লোককে অবাক করে দেওয়া যেত। পয়সা আদায় হতো লোকের কাছ থেকে। কথা-বলা পুতুল দিয়ে লোকে টাকা রোজগার করছে না?

—দূর, ওসব তো পুরনো হয়ে গেছে। নতুন কিছু চাই।

—নতুন কিছু? হ্যাঁ, আমার মাথায় একটা গ্র্যান্ড আইডিয়া এসেছে।

—কি আইডিয়া?

—ফটিক নাকি সেদিন কলকাতা গিয়ে মাসি সরকারের ম্যাজিক দেখে এসেছিল।

—মাসি সরকার! বলিস কিরে!

—হ্যাঁ, ঐ রকমই একটা নাম।

—মাসি সরকার নয়, পিসি সরকার।

—ঐ মাসি পিসি একই হলো। তিনি নাকি অদ্ভুত ম্যাজিক দেখান। ভূতের সঙ্গে কথা বলেন। ফটিক সেই ম্যাজিক দেখে এসে তার বন্ধু গালটুকে বলেছে। গালটু বলেছে, তার এক মামাও নাকি ভূতের সঙ্গে কথা বলতে পারে।

—তাই নাকি? তা হলে আমরাও ভূত নিয়েই গবেষণা করব। গালটুর মামাকে খুঁজে বের কর।

ফটিককে ধরে গালটুর মারফত আলাপ হয়ে গেল তার মামার সঙ্গে। নিজের মামা নয়, পাতানো মামা। অদ্ভুত চেহারা। বয়স কত কে জানে? তোবড়ানো গাল, কপালে একটা আব। নাম তুবড়িলাল। সে নাকি ভূতের ওঝা।

হাবলু তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি সত্যি ভূতের সঙ্গে কথা বলেন?

তুবড়িলাল জবাব দিল, হ্যাঁ, সত্যি বৈকি। বিপাকে পড়লে ভূত বাবাজী নিজেই বলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি। আমি তখন বলি, তুই সাতটা গ্রাম পেরিয়ে চলে যা। ভূত তাতেই রাজী হয়। আমি তখন তাকে ছেড়ে দেই।

গদাই জিজ্ঞেস করল, আপনি তাহলে ভূত ধরতেও জানেন?

তুবড়িলাল জবাব দিল, হ্যাঁ, তাও জানি। ভূত ধরার একটা যন্ত্রও আমার কাছে আছে।

হাবুল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, বলেন কি?

—হ্যাঁ। তবে সবসময় ঐ যন্ত্রটা ব্যবহার করি না। খুব দরকার বুঝলে ভূতকে ধরে ঐ যন্ত্রে পুরে রাখি। তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি কেমন ভূত। ভাল ভূত হলে ছেড়ে দিই। তাকে দিয়ে অনেক কাজকর্মও করাই। সে খুব অনুগত হয়ে যায়। আর খারাপ ভূত হলে এমন দূরে চালান করে দিয়ে আসি যাতে ভূত বাবাজী আর ঐ এলাকায় ফিরে আসতে না পারে।

গদাই বলল, কিন্তু ভূতকে কি আর ওভাবে তাড়ানো যায়? ওরা নাকি হাওয়ায় উড়ে চলে আসতে পারে?

তুবড়িলাল বলল, যাতে না আসতে পারে তার কৌশলও জানি। ভূতকে ছাড়ার পর এমন মন্ত্র আওড়াবো যে ওর ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

এমন মন্ত্র আওড়াবো....

এত সব কথা শোনার পর হাবুলের বিশ্বাস হলো লোকটা খুবই গুণী। তাই সে বলল, আমাকে ঐ রকম একটা যন্ত্র যোগাড় করে দেবেন?

তুবড়িলাল বলল, আমার যন্ত্ররটাই বেচে দেবো। আমি ছেড়ে দিচ্ছি ভূত তাড়ানোর কাজ। অনেক ভূত তাড়িয়েছি। কত ভূতকে দিয়ে কত কাজও করিয়েছি। আর ভাল্লাগে না।

গদাই জিজ্ঞেস করল, কি রকম কাজ করিয়েছেন ভূতকে দিয়ে?

তুবড়িলাল জবাব দিল, সে ওদের মেজাজ বুঝে করিয়ে নিতে হয়। কোনো পরিশ্রমের কাজ করার সময় ওরা সাহায্য করলে খুব সহজেই তা করা যায়। অথচ তুমি বুঝতেও পারবে না তোমার সঙ্গে ভূত কাজ করছে।

তুবড়িলালের কথা শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল হাবুলের মন। সে ভাবল, যে ভাবেই হোক যন্ত্রটাকে হাতাতে হবে। এটাকে কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। তাই সে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কত টাকা হলে বেচবেন?

তুবড়িলাল উল্টে প্রশ্ন করল, তুমি কত টাকা দিতে পারবে?

হাবুল ভেবে দেখল তার কাছে বিশ-পঁচিশ টাকার বেশি নেই। এত কম টাকায় দিতে রাজী হবে কি তুবড়িলাল? অবশেষে গদাই রফা করল ত্রিশ টাকায়। হাবুলের পঁচিশ আর গদাই বাড়ির লক্ষ্মীর ভাঁড় ভেঙে পাঁচ টাকার মতো দিতে পারবে। আশ্চর্য, তাতেই রাজী হয়ে গেল তুবড়িলাল।

পুরনো দিনের একটা কাঠের মহাজনী বাক্সকে রঙ করে তৈরি করা হয়েছে ভূত ধরার যন্ত্র। সেটাই তুবড়িলাল এনে হাজির করল। ত্রিশ টাকা কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নিয়ে শিখিয়ে দিল ভূত ধরার মন্ত্র।

তুবড়িলাল নিয়মকানুনও শিখিয়ে দিল হাবুলকে। কোনো জায়গায় ভূত আছে জানতে পারলে বাক্সের মুখ খুলে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কতগুলো ছেঁড়া কাগজের টুকরো রেখে দিতে হবে ভিতরে। তারপর মন্ত্র পড়তে হবে। কোন লোকটা মরে ভূত হয়েছে তা জানতে পারলে তো কথাই নেই। সেই লোকটার মূর্তি মনে মনে কল্পনা করতে হবে। তারপর মন্ত্র পড়তে হবে চোখ বুজে। কিছুক্ষণ পর পর চোখ খুলে দেখতে হবে বাক্সের ভেতর ছেঁড়া কাগজ নড়ছে কিনা। একটু নড়লেই বুঝতে হবে ভূত এসেছে। তখন চট করে বাক্সের মুখটা বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে বাক্সটাকে। ব্যস ভূত ধরা হয়ে গেল। এবার ভূতটাকে যেখানে চালান করতে চাও সেখানে নিয়ে যেতে হবে।

কৌতূহলী হয়ে হাবুল ও গদাই জিজ্ঞেস করল, তারপর?

তুবড়িলাল বলল, এবার একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিই। সেই মন্ত্রটা বলেই খুলে দেবে বাক্সের মুখ। তবে এসব কাজ রাতের বেলাই করবে। কারণ দিনের বেলা তেনারা বের হন না।

—ভূত যদি আমাদের তাড়া করে?

—সেই মন্ত্রও শিখিয়ে দিচ্ছি। ভূতকে পথ ভুলিয়ে দেবার জন্য ভুলভুলাইয়া মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের।

গদাই কাগজ ও ডটপেন নিয়ে তৈরি হলো মন্ত্রগুলি লিখে রাখার জন্য। অমনি হাঁ হাঁ করে উঠল তুবড়িলাল। বলল, না না, লিখে রাখলে মন্ত্রের গুণ থাকবে না।

হাবুল আর গদাইকে তাই মেনে নিতে হলো। বার কয়েক দুজনে আউড়ে নিতেই মন্ত্রগুলি প্রায় শেখা হয়ে গেল। সহজ মন্ত্র। তবে ভুলভুলাইয়া মন্ত্রটাই একটু বিদঘুটে। সহজে মনে রাখা যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু উপায় কি? লিখে রাখা যখন যাবে না।

হাবুল জিজ্ঞেস করল, ভূতের সঙ্গে যদি কথাবার্তা বলতে চাই তা হলে কি করতে হবে?

তুবড়িলাল বলল, সব ভূত কিন্তু কথা বলতে চায় না। তবে সেটা তাদের মেজাজের ওপর নির্ভর করে।

ভূত ধরার বাক্সটা পেয়ে হাবুল খুব খুশি। যে বাইরের ঘরটাতে সে থাকে তার দরজায় একটি ছোট পিচবোর্ডের ওপর লিখে দিল—ভূতবিশারদ এইচ নন্দী।

বাড়িতে হাবুল আর তার বড়মামা লালুচাঁদ ছাড়া পুরুষ মানুষ কেউ নেই। মামা যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন ততক্ষণ ছোট সাইনবোর্ডটা দরজায় থাকে না। মামা বেরিয়ে গেলেই ওটা ঝুলতে থাকে সগৌরবে। মামীমা চোখে কম দেখেন। কাজেই ধরা পড়ার ভয় কম।

ভূত-ধরা যন্ত্র কেনার পর হাবুলের প্রধান চিন্তা হলো ওটাকে কাজে লাগাতে হবে। ভূত নিয়ে নানারকম গবেষণাও শুরু করে দিল। গদাইকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগল কোথায় কোন বাড়িতে ভূত আছে। সেই ভূতের পরিচয়ও তারা জানবার চেষ্টা করল।

ভূতের উপদ্রব আছে খবর পেলেই হাবুল আর গদাই সেখানে ছুটে যায় কিন্তু হাতে-নাতে প্রমাণ কিছু পায় না। তারা ভাবে, ভূত ধরার যন্ত্রের খবর পেয়েই কি ভূতগুলি সব পালিয়ে যাচ্ছে?

দিনরাত শুধু চিন্তা, ভূত চাই, ভূত ধরতে হবে। ভূত ধরে যদি তার সঙ্গে কথা বলতে পারে তা হলে তো সোনায় সোহাগা। তবে সব ভূতের ভাষা তো এক নয়। সেই ভাষা বুঝবারও একটা কায়দা বের করতে হবে। তবেই কেল্লা ফতে। ভাগ্যিস সে কুকুর বেড়াল নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিল। তাই তার সামনে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ খুলে গেল। হাবুল ও গদাই হন্যে হয়ে ভূতের খোঁজে ঘুরতে থাকে অন্ধকার অলিগলিতে আর খানাখন্দে।

এদিকে হাবুলের বড়মামা লালুচাঁদের কাছে খবর এল—কচুবেড়িয়ায় তাঁর ভাই কালুচাঁদের খুব অসুখ। ভাইকে দেখবার জন্য লালুচাঁদ সেদিনই কচুবেড়িয়া চলে গেলেন।

এবারে বাড়িতে পুরোপুরি স্বাধীন হাবুল। সে জোরকদমে ভূত নিয়ে গবেষণা করতে পারবে। হঠাৎ সে একটা ভূতের গল্পের বইও পেয়ে গেল। তাতে অনেক রকম ভূতের নাম ও তাদের বিবরণ আছে। মণিকাঞ্চন যোগাযোগ হলো।

কদিন ধরে গদাই আসছে না। তার জ্বর। তাই একাই গবেষণা করতে থাকে হাবুল। যন্ত্রটা কাছে এনে ভূত ধরার মন্ত্র আওড়ায় সে। রাত্রিবেলা খোলা বারান্দায় ওটা রেখে দিয়ে মন্ত্র বলতে থাকে। যদি উড়ুক্কু কোনো ভূত ধরা পড়ে।

কেটে গেল প্রায় সাত দিন। একদিন মামী বললেন, হ্যাঁরে, তোর মামার দেখি ফিরে আসার নাম নেই। কোনো খবরাখবরও পাঠায় না। কি ব্যাপার!

হাবুল বলে, কি জানি কিছু বুঝতে পারছি না। ছোটমামার অসুখটা হয়তো খুব বেড়ে গেছে, তাই বড়মামাও আসতে পারছে না।

মামী বললেন, এদিকে যে রাত্রিবেলা আমার খুব ভয় করে।

—কিসের ভয়?

—ভূতের মতন কি যেন ঘুরে বেড়ায় ঘরে আর বারান্দায়।

হাবলু বলল, তুমি ভুল দেখেছ মামী। চোখে তো ভালো দেখতে পাও না।

মামী বললেন, আগে তো কোনোদিন এরকম দেখিনি। এখন দেখছি কেন?

—কবে থেকে দেখছ?

—তিন-চার দিন ধরে দেখছি।

হাবুল মনে মনে ভাবল, ভূত ধরার বাক্সটা বারান্দায় রাখার পরই হয়তো এই অবস্থা হয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো ভূত ধরা পড়বে এবার।

আরও দুদিন কেটে গেল। মামীমা প্রথম দিন কিছু বললেন না। পরের দিন আবার বললেন, কাল রাত্রে আমি ঘুমের ঘোরে শুনতে পেয়েছি কে যেন আমায় বৌদি বৌদি বলে ডাকছে। মনে হলো যেন তোর ছোটমামার গলা।

চমকে উঠল হাবুল। জিজ্ঞেস করল, তুমি ঠিক শুনেছো মামী?

—হ্যাঁ। ঠিক শুনেছি। তারপরেই ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো কে যেন পাশের ঘরে ঘোরাঘুরি করছে। ভূত না চোর কে জানে? কয়েক মাস আগে তো তোর ছোটমামা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিল তোর বড়মামার কাছে। কেউ হয়তো তার খবর পেয়েছে।

মামী যেন ভয়ে কুঁকড়ে যেতে লাগলেন। আর হাবুলের মনটা আনন্দে নেচে উঠল। সে বলে উঠল, ইউরেকা! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা খটকাও লেগে গেল তার। কচুবেড়িয়ার ছোটমামা মারা যায়নি তো?

সেদিন রাত্রেই যন্ত্রটা পরখ করতে লেগে গেল হাবুল। কিছু ছেঁড়া টুকরো কাগজ বাক্সের মধ্যে ভরে দূরে দাঁড়িয়ে ভূত ধরার মন্ত্রটা আওড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল বাক্সের কাগজগুলি যেন নড়ছে। হাবুল বুঝতে পারল ভূত ঠিক যন্ত্রের ভেতর ঢুকে পড়েছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাক্সের মুখটা বন্ধ করে দিল।

ব্যস, বন্দী হয়েছে ভূত বাবাজী। আর মামদোবাজি করতে পারবে না। এবার দড়ি দিয়ে বাক্সটা ভালভাবে বেঁধে ঘরের ভেতরে চৌকির তলায় লুকিয়ে রাখল। ভূতটা কোনো কথা বলে কিনা তা শোনবার জন্য বাক্সটার খুব কাছে গিয়ে কান পেতে রইল। কিন্তু কোনো কথা শুনতে পেল না। মনে মনে ঠিক করল পরদিন সন্ধ্যাবেলা ভূতটাকে অনেক দূরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে। মামীমাকে বড্ড জ্বালিয়েছে ভূতটা। আর জ্বালাতে পারবে না।

সকাল হবার পর সারাটা দিন খুব উত্তেজনার মধ্যে কাটাতে লাগল হাবুল। গদাই একবারও এল না। নিশ্চয় ওর জ্বরটা খুব বেড়েছে। হাবুল ভাবল, যাক, একপক্ষে ভালই হলো। ভূত ধরার ও দূরে ছেড়ে দিয়ে আসার বাহাদুরিটা সে একাই পাবে। জীবনে একটা বিরাট সুযোগ এসেছে তার।

একটু বেলা হতেই একটা কথা মনে পড়ে গেল হাবুলের। সে মামীকে জিজ্ঞেস করল, মামী, কাল রাত্রে ভূতটা তোমাকে জ্বালায়নি তো?

মামী বললেন, না।

হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল হাবুল, কেল্লা ফতে!

মামী হাবুলের এই অদ্ভুত আচরণের কোনো কারণ বুঝতে পারলেন না। বললেন, আমার কিন্তু ভাল লাগছে না বাপু। তোর মামা ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনো স্বস্তি নেই।

সেদিনও বড়মামা ফিরলেন না। সন্ধ্যা হতে না হতেই বাক্সবন্দী ভূতটা নিয়ে হাবুল রওনা হলো। মামীকে বলে গেল, মামী, আমি একটা বিশেষ কাজে এক জায়গায় যাচ্ছি। ফিরতে হয়তো একটু রাত হবে।

মামী আঁতকে উঠে বললেন, সে কি, একা আমার ভয় করবে যে।

—ভয়ের কিচ্ছু নেই মামী। ভূত-তাড়ানো মন্ত্র আমি শিখে নিয়েছি। সেই মন্ত্র তুমিও আওড়াতে পারো। তা হলে ভূত তোমার ধারেকাছেও আসবে না।

—মন্ত্রটা আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যা।

হাবুল বলল, ভূতের কোনো আভাস পেলেই বলবে, ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি?

মামী একটু শান্ত হলেন। হাবুলও বাক্সটা একটা ঝোলায় পুরে বেরিয়ে গেল।

পথের পর পথ হাঁটতে লাগল হাবুল। তবুও মনের মতো একটা জায়গা পেল না। ভাবল, আরও একটু দূরে নিয়ে গেলে ভাল হয়।

তুবড়িলাল বলেছিল ভূতের একটা মোটামুটি চেহারা মনে মনে কল্পনা করে নিলে কাজের খুব সুবিধা হবে। কিন্তু কোন ভূতের চেহারা সে মনে মনে কল্পনা করবে? যে ভূতটাকে সে ধরেছে সে কোন মরে যাওয়া মানুষের ভূত তাও সে জানে না। আন্দাজে কি কল্পনা করবে সে?

হাবুল পথ চলছে আর চিন্তা করছে। জানাশোনা ভূত আর কে আছে? মামীমা বলেছিলেন, ছোটমামার মতো একটা লোককে নাকি তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। সেই অসুস্থ ছোটমামা পটল তোলেনি তো? ছোটমামার তো বড়মামার বাড়িতেই আসবার কথা ছিল তার রেখে যাওয়া টাকাগুলি নিয়ে যাবার জন্য।

হাবুল পথ চলছে আর নানা আজগুবি কথা ভাবছে। যদি ছোটমামা মরে গিয়ে থাকে তবে ভূত হয়ে গেছে নিশ্চয়। টাকার মায়া নাকি ভূতেরাও ভুলতে পারে না। এসে এখানেও উৎপাত করবে। ভূতের কথা ভাবতে ভাবতে ছোটমামার মুখটাই শুধু হাবুলের চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

কতটা পথ হেঁটেছে তা নিজেই জানে না হাবুল। কোন পথ দিয়ে কিভাবে এসেছে তাও ভুলে গেছে। অচেনা জায়গা। তাকে ভূতেই যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। অন্ধকারে একটু দূরেই ঝাপসা দেখতে পেল একটা জঙ্গল। তার সামনেই একটা জলা জায়গা, তাতে জল নেই বলেই মনে হয়। ঐ জলাটা পেরিয়ে গেলেই জঙ্গলটা। ওখানে ভূতটাকে ছেড়ে দিলে ভূতবাবাজী আর ফিরে যেতে পারবে না। ভুলভুলাইয়া মন্ত্রটা তো পড়তেই হবে।

এদিকে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসছে। আর দেরি করলে চলবে না। তা হলে নিজেও বাড়ি ফিরতে পারবে না হাবুল।

জলাটা খুব চওড়া নয়। জলও তাতে নেই বলে মনে হচ্ছে। কিছুটা এগিয়ে যেতেই কাদায় হাবুলের পা আটকে গেল। পা টেনে তুলতে গিয়ে বাক্সসুদ্ধ ঝোলাটা পড়ে গেল হাত থেকে। কোনোরকমে সেটা তুলে নিয়ে হাবুল আবার চলতে লাগল জঙ্গলের দিকে।

কয়েক পা যেতেই কিন্তু আবার পড়ে গেল সে। একেবারে হুমড়ি খেয়ে। মনে হলো কোনো ভূতই বুঝি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। পড়ল আবার কাদার মধ্যেই। এবার যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন সে এক কাদামাখা কদাকার ভূত।

এবার ভয়ানক ভয় হতে লাগল হাবুলের। ভূতের ভয় তার ঘাড়ে চাপল। সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি?

কোনোরকমে জলাটা পেরিয়ে ওপরে উঠল হাবুল। জঙ্গলটা এখন একেবারে কাছে। ভাবল, অন্ধকারে জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে কাজ নেই। এখানেই একটা গাছতলায় ছেড়ে দিই ভূতটাকে।

ছাড়ার সময় মন্ত্রটা তো পড়তে হবে। চারদিকে কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব। তবু মনে সাহস এনে একটু জোর গলাতেই মন্ত্র আওড়াতে লাগল—

হিং টিং রিং রিং ভূতভুতুর ছানা,
ছেলে ভূত, মেয়ে ভূত দূর হয়ে যা না।
মেছো ভূত, গেছো ভূত,
মামদো ভূত, হামদো ভূত,
ব্রহ্মদত্যি, শাঁকচুন্নি সব হয়ে যা কানা।
হিং টিং ছট
পালা চটপট।

বলেই হাবুল বাক্সের মুখটা খুলে দিল। তার মনে হলো যেন কি একটা হাওয়ার মতো বেরিয়ে গেল বাক্সের ভেতর থেকে।

ভূতটা নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেল। এবার যে মন্ত্রটা আওড়ালে ভূত আর ফিরে যেতে পারবে না, সেই ভুলভুলাইয়া মন্ত্রটা বলতে হবে—

ভূত ভূত ভূতং ভূতং
যাবি আর কুতং কুতং—

তারপর? তারপর আর কিছুই মনে নেই হাবুলের। জলে কাদায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে সবকিছু তার গুলিয়ে গেছে।

মাথা ঘুরে যেতে লাগল হাবুলের। কান দুটো দিয়ে যেন

চেহারাটা ঠিক ছোটমামার মতো।

গরম বাতাস বের হতে লাগল। হায়! হায়! গদাই থাকলে সেই মন্ত্রটা জেনে নিতে পারত এই সময়ে। তার কোনো উপায় নেই। এখন সেই ভূতটাই যে তার ঘাড়ে এসে চাপবে!

ভয়ে কাঁপতে লাগল বুক। তার মনে হতে লাগল ভূত এবার তার সামনেই এসে দাঁড়াবে। কেমন সেই ভূতের চেহারা হবে কে জানে? ছোটমামা মরে গিয়ে যদি ভূত হয়ে আসে!

ভাবতে ভাবতেই তার কাছে এসে দাঁড়াল একটা ছায়ামূর্তি। আবছা অন্ধকারেও হাবুল বুঝতে পারল তার চেহারাটা ঠিক ছোটমামার মতো। ভয়ে ভয়ে সে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ছোটমামা কথা বলল, কিরে হাবুল, তুই এখানে কেন?

হাবুল সত্যি কথা গোপন করে জবাব দিল, মা-মা, ছো-ছোটমামা গো, আমি এখানে বেড়াতে এসেছিলাম।

—এখানে এত দূরে কেউ বেড়াতে আসে নাকি সন্ধ্যার পরে?

—এই....এই....বিশেষ একটা কাজ....

—বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এখন ফিরবি কিভাবে?

হাত-পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে হাবুলের। কোনোমতে একটু সাহস যুগিয়ে বলল, ছোটমামা, তুমি এখানে এলে কেন?

কালুচাঁদ বলল, আমি তো তোদের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। তোকে এখানে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তুই পথ হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি?

—হ্যাঁ, মামা। প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা হলো হাবুলের।

—আয়, আমার সঙ্গে চল।

হাবুল বাক্সটা হাতে নিয়ে বলল, চলো মামা।

আগে আগে চলল কালুচাঁদ, পেছনে পেছনে হাবুল। হাজার প্রশ্ন মনে জাগলেও কোনো কিছু সে জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেল না। শান্তশিষ্ট ছেলের মতো চলতে লাগল।

অনেক পথ। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে আসে। রাতের কালো আঁধার যেন আরও জমকালো হয়ে উঠছে।

এবার বাড়ির অনেকটা কাছে এসে পড়েছে তারা। ছোটমামা না থাকলে আজ যে কি দশা হতো হাবুলের!

দূর থেকে দেখা যায় বাড়িটা। ঘরে আলো জ্বলছে। এখনও জেগে আছেন বড় মামী।

ছোটমামা বলল, হাবুল, ঐ তো বাড়ির কাছেই এসে গেছিস। তুই যা। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। বলে পাশের একটি ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে আর দেখা গেল না তাকে।

হাবুলের যেন কি হয়েছে। সে কোনো কথাই ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারল না ছোটমামাকে। নীরবে বাড়ির দিকে চলল।

বাড়িতে এসেই দেখল বড়মামা কচুবেড়িয়া থেকে ফিরে এসেছেন। এত রাতেও হাবুল বাড়ি নেই দেখে মামা-মামী দুজনেই চিন্তা করছেন খুব। হাবুলকে দেখে তাঁরা আঁতকে উঠলেন। প্রায় চিৎকার করে বললেন, এ কিরে, তোর এই ভূতের মতো চেহারা হলো কেমন করে? কোথায় গিয়েছিলি? এত রাতে ফিরলিই বা কার সঙ্গে?

হাবুল বলল, ছোটমামার সঙ্গে ফিরলাম। ভাগ্যিস দেখা হলো!

চমকে উঠে বললেন বড়মামা, কি বলছিস? কালুর সঙ্গে ফিরলি? তাকে পেলি কোথায়? সে তো মারা গেছে গত শনিবার বারবেলায়। সেজন্যই তো আমার ফিরতে দেরি হলো।

হাবুলের সব গুলিয়ে যাচ্ছে...ছোটমামা....শনিবারের বারবেলায়....তাহলে জলার ধারে....ও কে....ভূত....বাক্স.....হিং টিং রিং রিং.....তার মানে....তার মানে.....

বড়মামার দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল হাবুল।

ছবি—রাহুল মজুমদার

জবানবন্দী

অসিতকুমার চৌধুরী

রিটায়ার করার পর তমালবাবু মামুদপুরের এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ পেলেন। সেখানেই তাঁকে থাকতে হবে। মামুদপুর ট্রেনে হাওড়া থেকে দু-আড়াই ঘণ্টার পথ। জায়গাটা ভালই লাগল তমালবাবুর।

প্রকল্পে কাজ করেন চারজন ডাক্তার, একজন টাইপিস্ট, ক্যাশিয়ার, জনা ছয়েক কেরানী। তাছাড়া কজন ট্রেনি নার্সও আছেন। তমালবাবুর কাজ হলো কেরানীদের কাজকর্ম দেখাশোনা করা।

ডাক্তাররা প্রায় সবাই নতুন পাশকরা ছেলে-ছোকরা মানুষ। দারুণ উৎসাহেই তাঁরা কাজ করেন। প্রকল্পের প্রধান, ডাক্তার সেন থাকেন কলকাতায়। প্রায় সপ্তাহেই কদিনের জন্য এসে কাজকর্মের তদারক করেন। সাধারণের চাঁদায় প্রকল্পের কাজ চলে। কিছু সরকারী অনুদানও পান ডাক্তার সেন।

মাসকতক বেশ ভালভাবেই কেটে গেল তমালবাবুর। লোকজনের ব্যবহার ভাল। কাজেরও তেমন চাপ নেই। তাছাড়া স্থানীয় কেরানীরাও ওঁকে যথেষ্ট সমীহ করে। থাকার ব্যবস্থা ভাল। মেস করে বাইরের সবাই থাকেন।

একদিন ডাক্তার সেন বললেন, তমালবাবু, নার্সদের ট্রেনিং-এর জন্য একটা কঙ্কাল আনতে হবে। ডাক্তার পাত্র যেতে রাজী হয়েছেন। আপনিও তাঁর সঙ্গে যান, ওটা কিনে আনুন গিয়ে।

কঙ্কাল কেনার কথাটা শুনে মনে মনে বেশ ভয়ই পেলেন তমালবাবু। একটা মানুষের আসল কঙ্কাল কিনে বয়ে আনতে হবে সঙ্গে করে! ব্যাপারটা যেন কেমন অস্বস্তি জাগাল ওঁর মনে।

ডাক্তার পাত্রের বয়স খুবই কম। হেসে বললেন, কেন মিছে ঘাবড়াচ্ছেন বলুন তো। নেড়েচেড়ে দেখে তো কিনব আমি। না হয় বাক্সটা বইবও আমি। আপনি শুধু সঙ্গে থেকে দরদামটা করবেন। তাতে অত ঘাবড়াবার কি আছে!

দোকানের মালিক একটার পর একটা কঙ্কাল এনে ওঁদের সামনে স্ট্যান্ডে টাঙিয়ে দিতে লাগলেন। তমালবাবু বিস্ফারিত চোখে সেগুলোর দিকে শুধু তাকিয়েই রইলেন। ওঁর বারবার মনে হচ্ছিল, ওগুলো একদিন মানুষের দেহ নিয়ে চলাফেরা করত। কে জানে ওদেরই কেউ হয়তো একদিন ওঁর পাশ দিয়েই হেঁটে গেছে। মনে মনে শিউরে উঠলেন তমালবাবু।

অনেক দেখাশোনার পর ডাক্তার পাত্র একটা কঙ্কাল পছন্দ করলেন। বললেন, এটা একটি মেয়ের কঙ্কাল। বোধহয় চোট পেয়ে মারা গেছিল মেয়েটি। তা হোক। এটাই নেব আমরা।

দরদাম করে কঙ্কালটা কেনা হলো। তারপর ওটাকে বাক্স-বন্দী করে ট্যাক্সিতে তোলার সময় তমালবাবু স্পষ্ট শুনতে পেলেন ব্যথাভরা একটা দীর্ঘশ্বাস। চমকে উঠে উনি তাকালেন বাক্সটার দিকে।

ডাক্তার পাত্র হেসে বললেন, কি অত ভাবছেন বলুন তো? আপনাকে ওটা আর ধরতেই হবে না। স্টেশনে কুলি নিয়ে নেব। আর ওখানে পৌঁছে, ওটা আমিই বয়ে নিয়ে যাব সেন্টারে।

মিছিমিছি চিন্তা করবেন না তো। সামান্য একটা কঙ্কাল।

ভয়ে ভয়ে তমালবাবু বললেন, আপনি যাই বলুন আর তাই বলুন, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, যার কঙ্কাল তার জীবনটা বড় দুঃখের ছিল।

হাসলেন ডাক্তার পাত্র। বললেন, হতেই পারে। দুঃখীদের কঙ্কালই তো বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। জীবনে সুখী যারা তারা আর এমন ভাবে কঙ্কাল হবে কি করে?

সন্ধ্যাবেলা কেন্দ্রে ফিরে এলেন ওঁরা দুজনে। তখনি গেটের কাছে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে। একটা আসল কঙ্কাল যে আনা হচ্ছে, তা মুখে মুখে চারদিকে রটে গেছিল এর মধ্যে। তাই দেখতে আশপাশের গ্রামবাসীরা এসেছে।

ডাক্তার পাত্র কঙ্কালটাকে অফিস-ঘরের স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে দিলেন। কঙ্কালটা স্ট্যান্ডে দুলতে শুরু করল। যারা এতক্ষণ বেশি সাহস দেখাচ্ছিল তারা সবাই ছুটে পালাল। বাকিরা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

পরদিন থেকে নার্সদের ক্লাস শুরু হয়ে গেল। পড়াবার সময় কঙ্কালটাকে ক্লাসরুমে নিয়ে যাওয়া হতো। অন্য সময় ওটাকে রাখা হতো অফিস-ঘরেই।

সেঘরে বসেই তো কাজ করতে হয় তমালবাবুকে। তাই চেষ্টা করেও ওটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না তমালবাবু। কাজের ফাঁকে ফাঁকে থেকে থেকেই ওঁর নজর গিয়ে পড়ে কঙ্কালটার দিকে। আর তখনি ওঁর বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা অনুভূতি জাগে। ভয় আছে তাতে, তাছাড়া আছে আরও একটা ভাব যা ওঁকে বারবার বলে মেয়েটা জীবনে সুখ পায়নি। ও তাই ওর দুঃখের কথা শোনাতে চায়। এ কথা কাউকে বলতে পারছিলেন না তমালবাবু। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়েই ওঁর দিন কাটছিল।

কদিন পরে টাইপিস্ট মুখার্জীবাবু এসে বললেন, আপনাকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আমি রোজ শেষে অফিস থেকে বার হই। নিজের হাতে তালা লাগাই দরজায়। চাবিটা নাইট গার্ড কিস্কুকে দিয়ে যাই। অথচ রোজ এসে দেখি রাতে কে আমার টাইপরাইটারটা ব্যবহার করেছে। আমার হাতের মেশিন অন্যে ব্যবহার করলে আমি টের পাই।

কিস্কুকে ডেকে তমালবাবু ধমকালেন। বললেন, আর যেন সে টাইপরাইটারটা ব্যবহার না করে। টাইপ শিখতে হলে ও তো বর্ধমানে গিয়ে দিনের বেলা শিখতে পারে। ওর তো রোজ নাইট ডিউটি।

কিস্কু থতমত খেয়ে বলল, স্যার রাতে তো আমি ওঘরে ঢুকি না। মুখার্জীবাবুর খুব সাহস, তাই সন্ধ্যের পর একা ওঘরে বসে টাইপ করেন। কঙ্কালটা দেখলেই আমার ভীষণ ভয় করে।

তমালবাবু ভাবলেন, ধরা পড়ে গিয়ে কিস্কু নিজের দোষ কাটাবার জন্যই এসব কথা বলছে। কিন্তু আজ এই ধমক খাওয়ার পর

বিস্ফারিত চোখে শুধু তাকিয়েই রইলেন।

আর সে নিশ্চয়ই ও মেশিনে হাত দেবে না।

বেশ কদিন কিছুই আর ঘটল না। কিন্তু তারপর একদিন মুখার্জীবাবু ভীষণ রাগ করে বললেন, আপনি যদি এখনি ব্যবস্থা না নেন তো টাইপ মেশিনটা খারাপ হলে তার দায়িত্ব আমি নেব না। ও তো আবার রোজ রাতে টাইপ করা শুরু করেছে। বিনা পয়সায় হাত পাকাবার সুযোগ ও ছাড়বে কেন?

অগত্যা কিস্কুকে বদলি করলেন তমালবাবু নিতাইয়ের জায়গায়। আর নিতাইকে আনলেন ওর জায়গায়। নিতাই তেমন লেখাপড়া জানে না। টাইপরাইটার চালাবার প্রয়োজনই হবে না ওর।

দুদিন পরে নিতাই এল ওঁর কাছে। এদিক ওদিক দেখে বলল, স্যার আমি অফিস ঘরে রাতে ডিউটি দেব না। আমাকে অন্য কোথাও বদলি করেন।

অবাক তমালবাবু বললেন, কেন ওখানে তোমার অসুবিধাটা কি হচ্ছে?

একটু ইতস্তত করে নিতাই বলল, আজ্ঞে রাতে অফিস ঘরের মধ্যে কেমন যেন এক অদ্ভুত শব্দ ওঠে, খট খট খট খট, একটানা শব্দ। ও শব্দ যে কোথা থেকে আসে কে জানে!

তমালবাবু হেসে বললেন, ইঁদুর-টিঁদুর হবে। ওর জন্য তোমাকে আমি বদলি করতে পারব না।

ব্যস্ত হয়ে নিতাই বলল, না স্যার না, ওঘরে ইঁদুর ঢুকবে কি করতে? তা ছাড়া একটানা অমন শব্দ তো ওঠে টাইপ মেশিন থেকে, আমি জানি। শব্দ ওঠে অথচ ঘরের দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ থাকে। তাহলে?

মনে মনে শিউরে উঠলেন তমালবাবু। কে অত রাতে বন্ধ ঘরে টাইপ করে? কই কঙ্কালটা আসার আগে তো এমন কথা কারও মুখে কখনও শোনা যায়নি! তবে কি.....

তবুও মুখে হাসি এনে বললেন, বেশ, আজ রাতে যদি শব্দ ওঠে তো দরজাটা খুলে দেখবে। বন্ধ ঘরে ভূতে তো মেশিন চালায় না!

ব্যাজার মুখ করে নিতাই চলে গেল।

মাঝরাতে হঠাৎ কিস্কুর চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল তমালবাবুর। ও ঘরের ডাক্তারবাবুও বার হয়ে এলেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কিস্কু ছুটতে ছুটতে এসে বলল, শীগ্গির আসুন স্যার। নিতাই অজ্ঞান হয়ে গেছে। আসুন জলদি।

অফিস ঘরের বারান্দায় নিতাই পড়ে আছে। অফিস ঘরের দরজা হাট করে খোলা। তমালবাবু দেখতে পেলেন রাতের বাতাসে অন্ধকারে কঙ্কালটা অল্প অল্প দুলছে। কেন যেন মনে হলো ওঁর, কঙ্কালটা ওঁর কানের কাছে সেই প্রথম দিনের মতোই গভীর দুঃখে নিশ্বাস ফেলল। কি যেন বলল ও। খুব ভয় পেয়ে গেলেন তমালবাবু।

ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করে দেখলেন। না ভয়ের কিছু নেই। মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতেই নিতাই চোখ মেলল। খানিকক্ষণ বোকার মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। তারপর ভয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

ডাক্তার পাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, নিতাই, কি হয়েছিল তোমার?

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল নিতাই। বহুকষ্টে কান্না থামিয়ে বলল, স্যার রাতে আমি আর এখানে ডিউটি দেব না। ও ঘরে ভূত আছে। মেমসাহেব ভূত।

তার মানে? অবাক ডাক্তার পাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছিল ঠিক করে বল তো! ভূত আসবে কোথা থেকে? কি বলছ তুমি?

কান্না-মেশানো গলায় নিতাই বলল, রোজকার মতো মাঝরাতে ঘরের মধ্যে একটানা খটখট আওয়াজ উঠতেই ও স্যারের কথা মতো মনে সাহস এনে দরজাটা খুলেছিল। বাইরের আলো ঘরের মধ্যে পড়তেই টাইপ মেশিনের সামনে বসে থাকা এক মেমসাহেব ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল। কি করে মেমসাহেব ঘরে ঢুকল এ কথা যখন ও ভাবছে হঠাৎ মেমসাহেব বদলে গিয়ে সেখানে ওই কঙ্কালটা বসে আছে ও দেখতে পেয়েছিল। আতঙ্কে ও চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

কিস্কু বলল, সেই চিৎকার শুনেই ও ওর ডিউটির জায়গা থেকে ছুটে এসে দেখে নিতাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কঙ্কালটা কিন্তু হাওয়ায় দুলছিল তার জায়গাতেই।

কেউ কিছু বলার আগেই ডাক্তার মুখার্জী ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। একটু পরেই ওঁর মুখে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ শোনা গেল। উনি বার হয়ে এলেন একটা কাগজ হাতে। বললেন, কাগজটা টাইপরাইটারে লাগানো ছিল। কেউ কিছু ওতে টাইপ করেছে। আলোয় কাগজটা নিয়ে গিয়ে পড়া হলো।

স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে তাতে, আমার নাম সিন্থিয়া ম্যাকডোয়েল। ক'বছর আগে ফ্রেডি ম্যাকডোয়েলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমি ম্যাকগ্রু জনসন কোম্পানীতে টাইপিস্ট ছিলাম। ফ্রেডির সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না আমি। ও ছিল ভীষণ লোভী ও অসৎ। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম ওকে বদলাতে। একদিন ওর সঙ্গে ঝগড়া হবার সময় ও হঠাৎ আমাকে ওর হকি স্টিক দিয়ে প্রচণ্ডভাবে মারে। রাগলে ওর জ্ঞান থাকত না। ওর সেই মারে আমি মরে যাই। টাকার লোভ দেখিয়ে ও ডাক্তার আলিকে দিয়ে আমার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে লিখিয়ে নেয়। সেই রাতেই আমাকে কবর দেওয়া হয়। আর সেই রাতেই কবর-চোররা আমাকে কবর থেকে তুলে নিয়ে যায়। আমি বিচার চাই। আমার বাবা খুব গরীব। তিনি থানায় ডায়েরি করেছিলেন, আমার মৃত্যু অস্বাভাবিক বলে। থানা কিছুই করেনি। আমি আপনাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছি। আপনারা কিছু করুন দয়া করে। তা না হলে আমার মুক্তি নেই।

ডাক্তার সেনের চেনাজানা কজন পদস্থ পুলিশ অফিসার ছিলেন। তাঁরা এ ব্যাপারে নতুন করে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। কবরখানায় গিয়ে সিন্থিয়ার দেহাবশেষ পাওয়া গেল না। কবর খালি। ফ্রেডি আর আলিকে তখন থানায় এনে জেরা করা শুরু হলো। জেরার মুখে ভেঙে পড়ে দুজনেই তাদের দোষ স্বীকার করল।

সিন্থিয়ার কঙ্কালটাকে আবার যথাযথ ধর্মীয় আচারে তাঁর কবরে শুইয়ে দেওয়া হলো। এর পর থেকে আর কেউ কখনও ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাতে টাইপ মেশিনে কাজ করেনি।

ছবি: সুফি

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ

এত দিন বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হতো জলের স্রোতকে কাজে লাগিয়ে। যাকে বলে জলবিদ্যুৎ। এ ছাড়াও বায়ুশক্তি, কয়লা

এবং পারমাণবিক শক্তি থেকেও বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। সম্প্রতি বেলফাস্টের কুইনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা স্কটল্যান্ডের সমুদ্রের পশ্চিম তটে বসিয়েছেন সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র। এই যন্ত্র দিয়ে খুব কম খরচায় সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। এভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করায় পরিবেশও দূষিত হয় না। বিদ্যুৎ তৈরির কাঁচামালও কখনো শেষ হবে না। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিচালক ডঃ ট্রেভর হোয়াই টেকার। আমাদের দেশেও যদি বিভিন্ন জায়গায় সমুদ্রতটে ঐ রকম যন্ত্র বসানো যায়, তাহলে আমরাও অল্প খরচে বিদ্যুৎ পাব আর লোডশেডিং থেকেও বাঁচব।

নোয়ার নৌকা চাই

পৃথিবীতে নাকি মহাপ্লাবন বিভিন্ন সময় হয়েছে। সারা পৃথিবী তখন ডুবে গেছে জলে। কেবল কিছু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আগাম আভাস পেয়ে বড় নৌকা তৈরি করে অনেকদিন জলে ভেসে থেকে বেঁচে যান ও পৃথিবীতে ভগবানের সৃষ্টি জীবজগৎ টিকিয়ে

রাখেন। আমাদের পুরাণে আছে মনুর গল্প। স্বয়ং ভগবান মৎস্য অবতারের রূপ ধরে নাকি সে সময় মনুর নৌকা জলের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যান। বাইবেলে আছে নোয়ার গল্প। দূরদর্শনে নোয়ার সেই নৌকা তোমরা অনেকেই দেখেছো। এরকম মহাপ্লাবনের ঘটনা নাকি পৃথিবীতে আবার ঘটতে চলেছে। বিজ্ঞানীরা সেরকমই আভাস দিয়েছেন।

পৃথিবীর দুই প্রান্তদেশ উত্তর আর দক্ষিণ মেরু সব সময় বরফাচ্ছন্ন থাকে। শীতলতম আবহাওয়ার জন্য সেখানে যুগ যুগ ধরে জমা হয়েছে বরফ। এই বরফের মাত্র শতকরা দশ ভাগ গলে জল হলেও পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলভূমি দু ফুট জলের তলায় চলে যাবে। হবে ভয়ংকর প্লাবন। খোঁজ পড়বে আর এক নোয়ার নৌকার। সেজন্য বিজ্ঞানীরা সতর্কতা দিচ্ছেন। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে গ্রীন হাউস এফেক্টের জন্য। সম্প্রতি উপগ্রহ নিমবাস-৭ তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিয়েছে। ১৯৭৮ সাল থেকে উপগ্রহটি সব সময় মেরু প্রদেশ দুটি লক্ষ্য করে যাচ্ছে। তার দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে গত দশকে মেরু প্রদেশে বরফের সঞ্চয় না বেড়ে শতকরা ২.১ ভাগ কমে গেছে। বরফ গলে জল হওয়ার পরিমাণও বাড়ছে। তাই নোয়ার নৌকাখানা গড়তে হলে এখনই চাই আরও অনেক সবুজ গাছ। গ্রীন হাউস এফেক্টকে তাহলেই এড়ানো যাবে।

হাঁদা-ভোঁদার

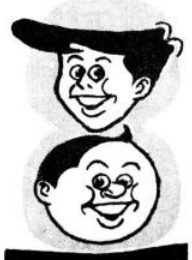

খাদ্যসঞ্চয়

কিছু সময় পরে

তারপরই
এই কাবার্ডটা সাফ করে ফেলি। গুল্টুবাবুর হাত থেকে রেহাই পেতে লুকোবার জন্যে এটার প্রয়োজন হতে পারে!
মরেচে!
এবার বাগান করার যন্ত্রপাতি রাখার ঘরে বাক্সটা লুকোই!
আমারও
এবার আমি এখানেও গুল্টুবাবুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে সম্ভাব্য লুকিয়ে থাকার জায়গা হিসেবে ঠিকঠাক করে রাখি!
শেষপর্যন্ত
আমার এই সঞ্চয় করা খাদ্য আমি ঠিক কাঠবেড়ালির মতো এই গাছের ওপর লুকিয়ে রাখি!
এদিকে গাছের নীচে
এই যে, ভদ্রমহোদয়! হয় ঝড়াক করে মালকড়ি কি আছে বার করুন। নয়তো এটা চার ইঞ্চি গলায় ঢুকে যাবে!
উওফ্!
ঠকাং!
ওফ্!
দারুণ করেছো, ভোঁদা! ডাকুর চাকু আমার গর্দানে বসার আগেই তুমি ওকে কাত করে আমাকে আর আমার টাকা বাঁচিয়েছো!
খেয়ে যাও, ভোঁদা! হাঁদাকে তাড়া করতে গিয়ে ডাকাতের খপ্পরে পড়েছিলাম, তুমি বাঁচিয়েছো! যতো পারো খেয়ে যাও!
উরফস্!

অরণ্যপতি টারজান

সব্যসাচী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আঁধার রাত। ইংরেজ শিবিরে আলো আছে যথেষ্ট, জার্মান পরিখা একেবারে অবলুপ্ত, অদৃশ্য। তারাও আলো জ্বালিয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু জ্বালিয়েছে মাটির অনেক তলায়, পঞ্চাশ ফুটের গভীরে। তার ছটা ভূপৃষ্ঠ থেকে দৃষ্টিগোচর কী করে হবে? সুতরাং জার্মান পরিখার আশপাশ সবই আঁধারে ঢাকা। রাতের পাহারা যথাস্থানে বসে গিয়েছে। খাওয়ার পাট মিটিয়ে নিয়ে পরিখা-রক্ষকেরা আর এক ঘণ্টার মধ্যেই শুয়ে পড়বে নিজের নিজের জায়গায়।

হঠাৎ গুরুগুরু শব্দে কেঁপে উঠল চারিদিক। পরিখার নিচে জটলা করছিল জার্মান রং-রুটেরা, তারা চমকে বেরিয়ে এল নিজের নিজের কোটর ছেড়ে। তক্ষুণি আবার ঘনঘোর গর্জন। যেন একটা সিংহ দৌড়ে আসছে কেশর দুলিয়ে। সৈন্যেরা সারি দিয়ে দাঁড়ালো চক্ষুর নিমেষে। নিশ্চয় ইংরেজরা নতুন রকম কোনো মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে। এই আওয়াজ সেই অস্ত্রের। সিংহগর্জনের মতো শোনাচ্ছে বটে অস্ত্রটার শব্দ, কিন্তু সম্ভবত ও আওয়াজ কোনো যন্ত্র চালনার ফলে উৎপন্ন। সিংহ? সিংহ আসবে কোথা থেকে এই পঞ্চাশ ফুট গভীর পাতালে? তাছাড়া, উপরে পাহারা রয়েছে না? সিংহ দেখলে তারা সতর্ক হবার সংকেত দিত না?

সংকেত! পাহারায় যারা ছিল, তারা চেঁচাতে চেঁচাতে এসে পড়ছে—"সিংহ! সিংহ! কার্লোভামকে গিলে খেয়েছে! মেইনল্যাং বেচারার ঘাড় ভেঙে দিয়েছে এক থাবায়। অন্ততঃ এক ডজন সিংহ হানা দিয়েছে ট্রেঞ্চে।"

এবার পালাবার পালা ট্রেঞ্চ থেকে। এক ডজন বা তিন ডজন হবারই বা আটক কী? অমন ধারাবাহিক গর্জন কি একটা সিংহের গলা থেকে বেরুতে পারে?

পালাচ্ছে জার্মানেরা। তাদের মাঝে চরকিবাজির মতো ঘুরছে ফিরছে লাফাচ্ছে একটা বিশাল সিংহ। তার আক্রমণে অনেক সৈনিক হতাহত হয়েছে এই পাঁচ মিনিটেই।

জার্মান পালাচ্ছে। পিছন থেকে পরিখায় নামছে ইংরেজ সেনা। কে রুখবে ইংরেজদের? জার্মানেরা কামানের গোলায় মরতে রাজী। সিংহের পেটে যাবার জন্য তারা যুদ্ধের খাতায় নাম লেখায়নি।

জেনারেল নর্থহ্যামটন ছাড়তে চান না টারজানকে। "আপনি

জানেন না, আমার তথা মিত্রশক্তির কতখানি উপকার করেছেন আপনি। ঐ পরিখাটা দখল করে নিতে না পারলে আমার প্রমোশনটা বাতিল হয়ে যেত, এই শিবিরটাও রক্ষা করা যেতো না। তার পরিণাম কী হতে পারত বোঝেন তো নিশ্চয়ই? ইংরেজের আর ইজ্জত বলে কিছু থাকত না আফ্রিকার আদিবাসীদের চোখে। আমি আপনার কথা যুদ্ধবিভাগকে জানাব।"

"যুদ্ধবিভাগ মানে তো মার্কুইস এ্যাল-হোমার? তিনি খানিকটা জানেন আমাকে।" জবাব দিল টারজান, "আপনি এত উচ্ছ্বসিত না হলেও পারেন আমার সম্পর্কে। পরিখা-দখল বা অন্যভাবে সাফল্য অর্জন, এ-সবেরই কৃতিত্ব আপনার একার। কিন্তু সেকথা নিয়ে বিতর্কের আবশ্যক নেই। ছুটি আমায় দিতেই হচ্ছে। আমার ওয়াজিরিস্তানের খামারটা একেবারে তছনছ করে দিয়েছে পাষণ্ড জার্মানেরা। আমাকে এদিকপানে ছুটে আসতে হয়েছিল, সেই দলের জার্মান কাপ্তেনটাকে তার নৃশংসতার দণ্ড দেবার জন্য। সে-কাজ সমাধা করেছি, এখন ফিরে গিয়ে দেখতে হবে, যেসব ওয়াজিরি যোয়ান প্রাণ দিয়েছে আমার স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে, তাদের পরিজনবর্গকে যথোচিত প্রতিদান দেওয়া যায় কেমন করে।

নিবিড়ভাবে করমর্দন করে পরস্পরের কাছে বিদায় নিলেন ওঁরা। সেনাপতি ফিরলেন নিজের হেডকোয়ার্টারের দিকে, টারজান অগ্রসর হলো অদূরবর্তী বনভূমির দিকে। ওখানকার গোটাকতক বৃহৎ মহীরূহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার। যদি পর পর ঐ রকম বৃহৎ বৃক্ষ দেখতে পাওয়া যায় অন্ততঃ দুই চার মাইল জায়গা জুড়ে, তাহলে আরণ্যশূন্য পথে উড়বার একটা চেষ্টা করা মন্দ নয়। সেটাও শ্রমসাধ্য ব্যাপার, সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-পথ এই মুহূর্তে টারজানের পক্ষে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলে বোধ হয়। পরিখা থেকে বিতাড়িত জার্মানেরা অনেকেই অরণ্যের দিকে পালিয়েছে সিংহের ভয়ে দিশেহারা হয়ে। এ সময়ে আর তাদের কোনো বৃহৎ দলের সম্মুখীন হতে চাইছে না টারজান।

যা সে আশঙ্কা করেছিল, সেইটাই কি ঘটে গেল? দল নয় অবশ্য, একটি মাত্র সৈনিক। অরণ্য থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে চলে আসছে ইংরেজ শিবিরের দিকে। টারজান একটা ঝোপের ভিতরে দাঁড়ালো আত্মগোপন করে। টারজান লোকটার গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে চায় আগে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তাকে অক্ষত দেহে যেতে দেওয়াই উচিত হবে, না ধরে নিয়ে গিয়ে নর্থহ্যামটনের করে সমর্পণ করা হবে, ভেবে দেখা যাবে তখন।

ইংরেজপক্ষীয় কোনো লোকের যে অস্তিত্ব থাকতে পারে এই অরণ্যে, এই খণ্ডযুদ্ধে সাফল্য লাভের পরেও, তা বোধহয় লোকটা ভাবেনি। করে বসল একটা হঠকারিতার কাজ। রণ-বিজ্ঞানে যা

লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরালো

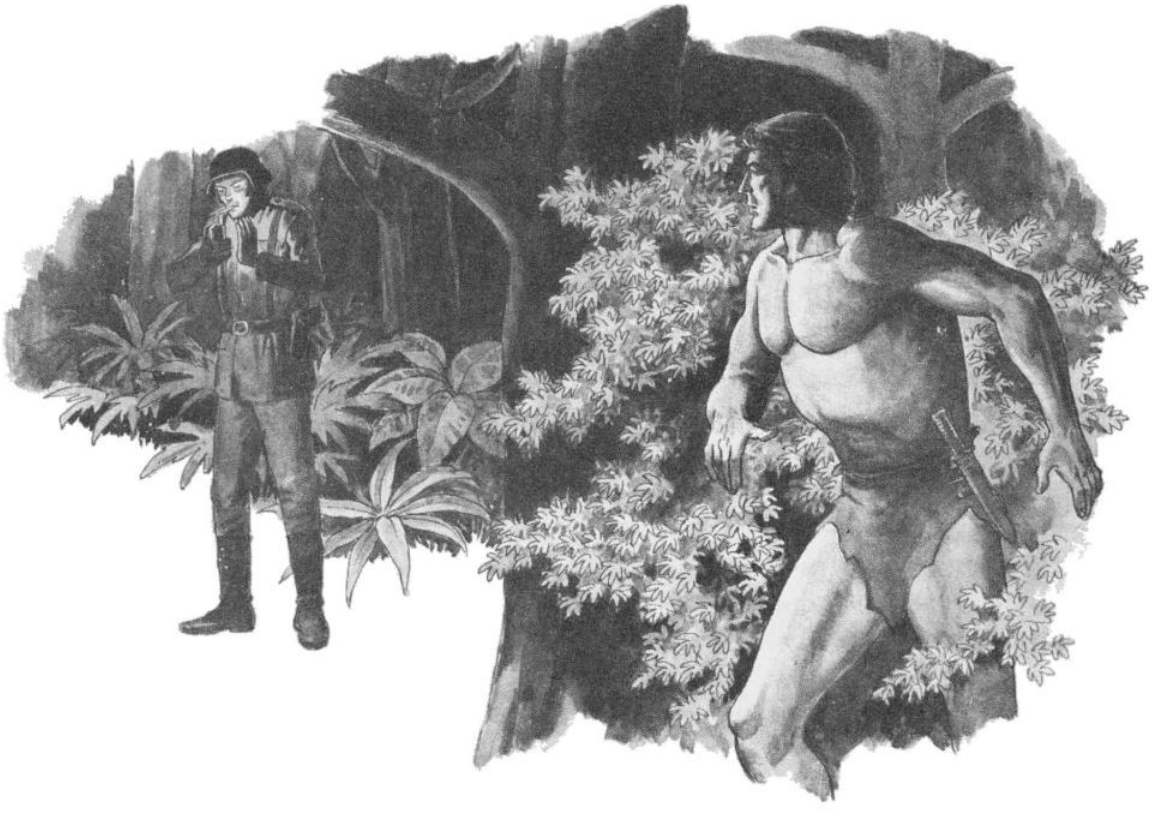

সর্বথা বর্জনীয় বলে অভিহিত, এমনই কাজ একটা। লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরালো। সেই লাইটারের আলোই যে তার মুখের উপর পড়েছে, আর সে মুখ কোনো শত্রুর চোখে পড়লে যে বিপদ ঘটতেও পারে, এই মোটা কথাগুলোই তখন তার মাথায় নেই। জার্মান-ইংরেজে একটা ছোটখাটো লড়াই হয়ে গেল এইমাত্র, তাতে এক পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিল একটা সিংহও। কাজেই দ্বিপদ চতুষ্পদ দু-রকম শত্রুরই সঙ্গে হঠাৎ এই অরণ্যে দেখা হয়ে যেতে পারে এই লোকটার। হয় যদি, তার ফল মারাত্মকই বা না হতে পারবে কেন?

লাইটারের আলোতে মুখখানা নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করছে টারজান। আলোটা ঝাপসা, তা ঠিক। কিন্তু টারজানের চোখই যে জ্বলন্ত মশাল এক জোড়া। অন্ধকারেও দেখতে পায় সে চোখ। কাজেই, এদিকে টারজানের সেই আঁধারভেদী দৃষ্টি, ওদিকে অপরিচিত লোকটার মুখে লাইটারের আলো, দুই মিলে টারজানকে কী যেন মনে করিয়ে দিতে চাইছে। কী যেন সাম্প্রতিক ব্যাপার। মুখখানা যেন চেনা-চেনা লাগছে। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে চেনা মুখ।

টারজান ততক্ষণই লোকটার পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে যতক্ষণ ওদিকে জ্বলেছে লাইটারটা। তারপর লাইটারও নিবলো, সেও সে চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। তার হাতে জরুরী কাজ রয়েছে না? ন্যুমাকে সে হারাতে চায় না। সে প্রায় পোষ মেনেছে, তার দ্বারায় কার্যোদ্ধার হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ। এমন গুরুত্ব সে কাজের যে ভিতরের কথা প্রকাশ করে দিলে যুদ্ধবিভাগ ফাঁপরে পড়ে যাবেন যে আজ রাতের ব্যাপারের জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রস্ তাঁরা কাকে দেবেন টারজান ওরফে লর্ড গ্রেস্টোফকে, না আফ্রিকার মহারণ্যচারী এক অজ্ঞাতকুলশীল চতুষ্পদকে।

না, এই ন্যুমাটিকে টারজান কাছে কাছে রাখতে চায়। ওকে ব্যক্তিগত পার্শ্বচরের মতো কাছে কাছে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে আরও যে কত কত উপকার ওর দ্বারায় হতে পারবে টারজানের, তা কে বলতে পারে?

কিন্তু উপকারী বন্ধুবর গেল কোথায়? এত কাছাকাছি পেয়েও তারপর যদি টারজান তাকে হারিয়ে ফেলে, তাহলে কি সহজে আর খুঁজে পাবে তাকে? এই সুবিরাট মহাদেশ আফ্রিকার কোন মহারণ্যে, কোন মরুস্থলীতে, কোন গিরিকন্দরে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে, তার ঠিক কী? অতএব, টারজানের এই মুহূর্তের সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে সিংহ-সহচরটিকে পুনরাবিষ্কার করে এমন কিছু ব্যবস্থা করা, যাতে সে আর টারজানকে ত্যাগ করার কথা ভুলক্রমেও না ভাবে কোনোদিন। সুতরাং রইল ঐ সিগারেট-সেবনরত মানুষটা সর্পসংকুল ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে। টারজান চললো তার সিংহবন্ধুর সন্ধানে।

সিংহবন্ধুর সন্ধানে? কাজটা কি অতই সহজ? পরিখামুখে নিয়ে সিংহকে যখন ছেড়ে দিয়েছিল টারজান, তখন পশুরাজ ছিল উপবাসী, ক্ষুধার্ত। টারজানকে সে পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে জানত, অন্নদাতা পিতা বলে। কাজেই সুশীল বালকের মতো তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে, এবং গুহামুখে আমিষের গন্ধ পেয়ে ঝাঁপ দিয়েছে তার ভিতর, প্রলয় হুঙ্কারে শত্রুমিত্র সবাইকে সচকিত করে। কিন্তু এখন? এই গুরুভোজনের পরে তার কি আর কৃতজ্ঞতার কথা মনে থাকতে পারে? থাকত যদি, টারজানকে এখন বন্ধুর খোঁজে আঁধার অরণ্য চষে বেড়াতে হতো না। আহারতৃপ্ত ন্যুমাকে আবার সে নিজের কাছেই দেখতে পেতো।

দুজনের বিচ্ছেদ ঘটেছিল অন্ততঃ তিন ঘণ্টা আগে। পরিখায় দৌড়ঝাঁপ আধঘণ্টার বেশি সময় নেয়নি ন্যুমা। তারপর এই আড়াই ঘণ্টা সময় কী করে কেটেছে তার? ঘুমিয়ে? না, অমন যথেচ্ছ নিদ্রাবিলাস বৃহৎ জানোয়ারদের ভিতর দেখা যায় না। রাত্রিকালটা হলো তাদের শিকারের কাল। সাময়িক ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই যে শিকারে মাতে পশুরা সব সময়, তা তো নয়। টারজানের ন্যুমা যদি সেই শিকারেই মেতে গিয়ে থাকে, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে? সেরকম কিছু ঘটে থাকলে সে এই আড়াই ঘণ্টায় কোন দিকে কতদূর গিয়ে পড়েছে, তা নির্ণয় করার উপায় কী?

আছে উপায়। অন্য কারও পক্ষে না থাকলেও টারজানের পক্ষে নিশ্চয়ই আছে। কারণ তার শৈশব, কৈশোর, বাল্য লোকালয়ে কাটেনি, কেটেছে প্রকৃতি মায়ের অঞ্চলাশ্রয়ে, কাজেই বন্য পশুপাখিদের মতোই তারও অটুট রয়ে গিয়েছে প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাগুলি। সেই সব ক্ষমতার মধ্যে অগ্রগণ্য একটি হলো ঘ্রাণের শক্তি। সেই ক্ষমতার বলে পলাতক ন্যুমার গমনপথ টারজান অনায়াসে নির্ণয় করতে পারবে। টারজান আশান্বিত অন্তরেই বন্ধুর সন্ধানে বেরুলো।

মিনিট দশেকের ভিতরেই আবিষ্কার করল একটা জ্যোছনাদীপ্ত ফাঁকা জায়গা, সেখানে অর্ধভুক্ত একটা দেহ পড়ে আছে। এই তো! এই তো ন্যুমা মহারাজের হাতের কাজ।

ঘটনাস্থলে দুটো গন্ধ ওতপ্রোত মিশে আছে। একটা মানুষের গায়ের, একটা সিংহের। মানুষের গন্ধটা এইখানেই উবে যাওয়ার কথা। কিন্তু ন্যুমার গন্ধটা তো থাকবেই হাওয়ায়! কোন দিকে গেল সে গন্ধ?

জায়গাটাকে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করল টারজান। অর্ধবৃত্ত ঘুরে আসার পরই পেয়ে গেল একটা ঝোপ, সেখানে সিংহদেহের গন্ধ খুবই প্রবল। অর্থাৎ পশুরাজ এখানে বসে বা শুয়ে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করেছিলেন। তারপর?

(চলবে)

ছবিঃ নারায়ণ দেবনাথ

সত্যি !

রক্ত না আর কিছু

এডওয়ার্ড মুজ থাকতেন সিনসিনাটি শহরের বোয়েল স্ট্রিটে। উনিশশ' পঞ্চান্ন সালের বাইশে জুলাই বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তিনি যখন বাড়ির সংলগ্ন বাগানে কাজ করছিলেন তখন তাঁর হাতে কয়েক ফোঁটা লাল রঙের গরম জল এসে পড়ে। দেখতে দেখতে এই লাল জল বৃষ্টির মতো তাঁর চারপাশে ঝরতে থাকে। বাগানে ছিল একটা পিচ ফলের গাছ। বৃষ্টির জল তার ওপরও এসে পড়ে। ওপর দিকে তাকিয়ে মুজ দেখতে পান হাজার ফুট ওপরে এক অদ্ভুত ধরনের মেঘ। মেঘপুঞ্জটি আকারে খুব বড় না হলেও তার রঙ ছিল একাধারে গাঢ় সবুজ, লাল আর গোলাপী। লাল রঙটা হুবহু বৃষ্টির রঙের মতো। বৃষ্টিটা অবশ্য হচ্ছিল শুধু ওই মেঘপুঞ্জ থেকেই। মুজ যখন ভাবছেন মেঘটা কি হতে পারে, ঠিক তখনি তিনি অনুভব করেন হাতের যে সব জায়গায় লাল জল এসে পড়েছে সেইসব স্থানগুলো ভীষণ জ্বালা করছে। তিনি দৌড়ে ভেতরে গিয়ে সাবান আর গরম জলে ভাল করে হাত দুটো ধুয়ে ফেলেন। জলটাতে কিরকম একটা চটচটে আর তেলতেলা ভাব ছিল। দেখতে ছিল ঠিক রক্তের মতো।

পরের দিন সকালে মুজ দেখেন তাঁর পিচ ফলের গাছটা মরে গেছে। গাছের তলার ঘাস সব শুকিয়ে গেছে। ফলগুলো কুঁকড়ে ডালে ঝুলছে। বৃষ্টির সময় আকাশে কোনো প্লেন ছিল না যে বলা যাবে জল ওখান থেকেই এসেছে। কোনো রাসায়নিক কারখানার ধোঁয়াও অমন মেঘের আকার নিয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। তবে? বিমানবাহিনীর লোকজন আসে অনুসন্ধান করতে। তারা মুজকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গাছ, ঘাস, আর ফলের নমুনা নিয়ে যায় পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষার ফলাফল তারা প্রকাশ করেনি। তাই আজ পর্যন্ত এ রহস্যের কোনো কিনারাও হয়নি।

অতিকায় প্রাণী

অনেকেই বিশ্বাস করেন স্কটল্যান্ডের লক্ নেস হ্রদে থাকে এক ভীষণ দানব। তাকে চাক্ষুষ দেখেছেন বলে দাবিও করেন কেউ কেউ। এঁদের দলে পড়েন জর্জ স্পাইসার দম্পতি। উনিশশ' তেত্রিশ সালের জুলাই মাসে তাঁরা স্কটল্যান্ডে গিয়েছিলেন ছুটি কাটাতে। বাইশ তারিখে হ্রদের দক্ষিণ দিক দিয়ে তাঁরা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পাহাড়ের গায়ের গাছপালা কাঁপিয়ে সামনেই উদয় হলো এক বিশাল প্রাণী। তার গলাটা খুব লম্বা। প্রাণীটা ছিল গাড়ি থেকে দুশ' গজ দূরে। হতভম্ব স্পাইসার তাড়াতাড়ি গাড়ির স্পীড কমিয়ে দেন তাকে ভালোভাবে দেখবেন বলে। কিন্তু জায়গাটার কাছে পৌঁছাবার আগেই প্রাণীটা সরু রাস্তা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরে স্পাইসার প্রেসকে বলেন, প্রাণীটার উচ্চতা ছিল চার ফুট আর দৈর্ঘ্য ছয় ফুট, গা-টা ঢেউ-খেলানো, রঙটা হাতির মতো কিন্তু আরো গাঢ়, আর তার চামড়ার ধরনটা দেখলে প্রথমেই মনে আসবে একটা শামুকের কথা। এই কুৎসিত অতিকায় প্রাণীটাকে যাঁরা দেখেছেন বলে দাবি করেন তাঁদের কারো বর্ণনা কিন্তু একে অপরের সঙ্গে মেলে না।

☐ হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চল সপ্তর্ষি সরোবরের ওপারে একটি গ্রামে একদল মানুষ থাকে। অদ্ভুত ভাষায় তারা কথা বলে। কথাটা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন ডাঃ দাশ। আর তারপরই....

☐ জলপাইগুড়ি শহর থেকে মাইলখানেক দূরে মস্ত বড় একটা বাগানবাড়ি। সেই বাড়িতে বেড়াতে এসেছে তিন বন্ধু! সন্ধ্যের সময় জমিয়ে বসেছে গল্প করতে আর তখনই লোডশেডিং। তারপরই ভয়ে, আতঙ্কে ওরা কেঁপে উঠলো.....

জানো কী

☐ জাহাজের কেবিনের মধ্যে হাতে পায়ে লোহার শিকল বাঁধা দীর্ঘকায় এক পুরুষ ছটফট করছেন। স্পেনের রাজার হুকুমে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেন, কি তাঁর অপরাধ?

☐ হঠাৎ এগিয়ে এলো একটা বাঁদর। ইশারায় মিউকে কিছু বললো। কিকিকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেলো মিউ। আর তারপরই....

কি হলো তারপর? জানতে পারবে শুকতারার শ্রাবণ সংখ্যায়। সেই সঙ্গে আরো অনেক কিছু যা তোমাদের চমকে দেবেই।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

স্বামী মুক্তিকামানন্দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খাণ্ডোয়া ঃ

খাণ্ডোয়াতে ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজী একদিন এক উকিলের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছেন ভিক্ষার জন্যে। উকিল শ্রী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কাছারি থেকে ফিরছেন। সাধুকে নিজের বাড়ির দরজায় দেখে তিনি ভাবলেন সামান্য এক সাধু মাত্র, দু-একটি কথা বলেই ভেতরে চলে যাবেন। কিন্তু কথা শুরু করেই বুঝতে পারলেন এ সন্ন্যাসীটি অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান। তখন বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে স্বামীজীকে সেখানেই থাকতে অনুরোধ করলেন। স্বামীজীও সম্মত হলেন।

খাণ্ডোয়াতে স্বামীজী তিন সপ্তাহ ছিলেন। এক জায়গায় টানা এত দিন বসে থাকার মানুষ তিনি নন। এই সময় তিনি ইন্দোর যান। এর প্রমাণ আছে। শিপ্রা নদীর তীরে উজ্জয়িনীতে মহাকাল ও নর্মদাতীরে ওঁকারেশ্বর শিবও দেখতে গিয়েছিলেন। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে এ দুটি পড়ে। আর স্বামীজীর মতন ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি যে ইলোরা দেখতে যাবেনই সে কথা নিশ্চিতরূপে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

খাণ্ডোয়ায় স্বামীজীর সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল। সেখানে স্বামীজী গীতা-উপনিষদ থেকে কিছু কিছু অংশ পড়ে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন যে সংস্কৃতজ্ঞ যে সব পণ্ডিতরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই মুগ্ধ হয়ে যান।

সবাই বলাবলি করতে থাকেন আগামী কালে ইনি একজন বিশ্বজয়ী ব্যক্তি হবেন। এ কথা শুনে স্বামীজীর মুখ লাল। কিন্তু তিনিও সে কথা স্বীকার করে বললেন, হাঁ, তাঁর গুরুদেবও এই কথা আরো জোরালোভাবে বলতেন। এমনি করে চিকাগো-ধর্মসভায় যোগ দিতে যাওয়ার ইচ্ছার বীজ বোনা হলো আর তা এমন স্নেহের জলসিঞ্চনে ক্রমশই অঙ্কুরিত হতে থাকল। এই কাজটি প্রথম করেন জুনাগড় ও পোরবন্দরের পণ্ডিতসমাজ।

বোম্বে

হরিদাসবাবুরা চেয়েছিলেন স্বামীজীকে খাণ্ডোয়াতেই রেখে দেবেন। সেইজন্য তাঁর সেবা-যত্নের অভাব রাখেননি তাঁরা। স্বামীজীও তাঁদের যত্নে প্রীত হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি তাঁদের বললেন, রামেশ্বর পর্যন্ত আমাকে যেতেই হবে। আমাকে তোমরা যেতে দাও।

খাণ্ডোয়াবাসীদের কাছে বিদায় নিয়ে স্বামীজী ট্রেনে উঠলেন বোম্বে যাবেন বলে।

জুলাইয়ের শেষে বোম্বে পৌঁছলেন স্বামীজী। সেখানে উঠলেন

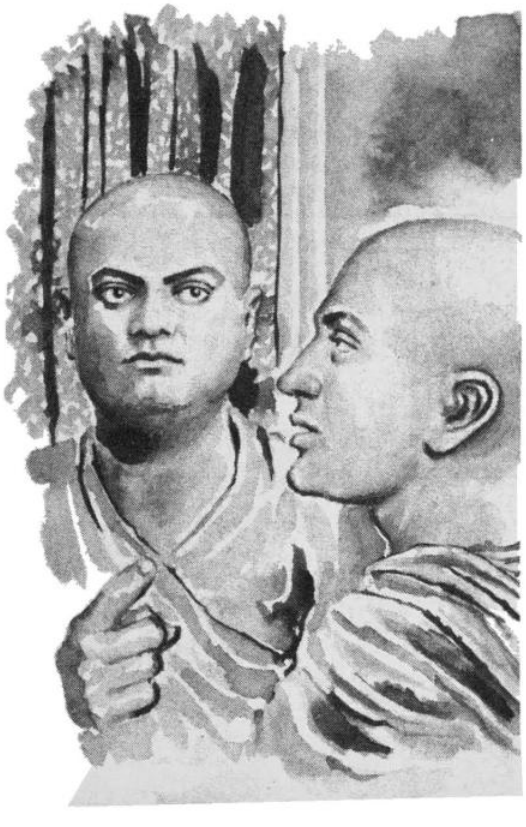

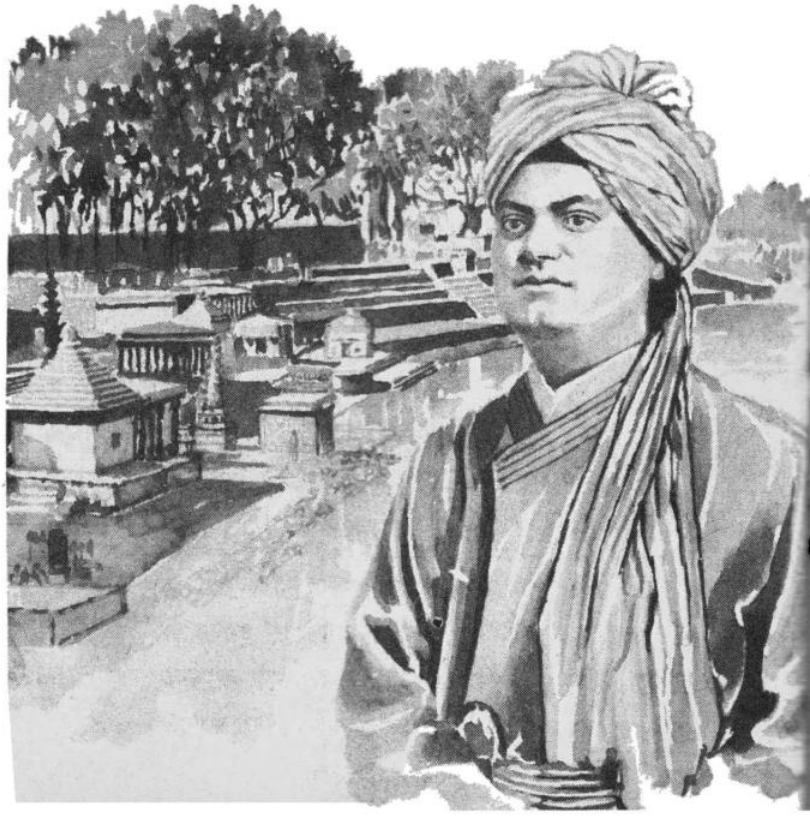

ব্যারিস্টার রামদাস ছবিলদাস মশাইয়ের বাড়িতে। হরিদাসবাবুর কাছ থেকে পরিচয়পত্র তিনি নিয়ে এসেছিলেন। দৈবক্রমে এইখানে অভেদানন্দজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। অভেদানন্দজী তো স্বামীজীকে দেখে অবাক। তাঁর মনে হলো স্বামীজীর হৃদয়টা যেন একটা আগুনের কুণ্ড। কেবল চিন্তা, ভারত কেমন করে তার অতীত আধ্যাত্মিকতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। স্বামীজীকে একটি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বলে মনে হলো অভেদানন্দজীর। স্বামীজী বলেছিলেন, জগৎ যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে এবং সব জাত তাদের নিজের নিজের অবদান যে সভ্যতার পুষ্টিতে প্রয়োগ করছে, তা শিবসুন্দর রূপ নেবে ভারতের আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ রূপকে গ্রহণ করলে।

বোম্বে থেকে পুণা যাওয়ার সময় ট্রেনে তিলকজীর সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হয়। পুণা থেকে স্বামীজী ভাবনগরের মহারাজের চিঠি নিয়ে কোলাহাপুরে যান।

কোলাহাপুর

কোলাহাপুরের রানী ভক্তিভরে স্বামীজীকে গেরুয়া কাপড় দান করেন। স্বামীজীকে সামান্য কিছু দিতে পেরেই তিনি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী মনে করতেন। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও যথারীতি পণ্ডিতসমাজ স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁরা সবাই মিলে এক আমজনতার সামনে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু স্বামীজী তখন ঠিক ঐভাবে বক্তৃতা করতে চাইছিলেন না। শেষে এক ছোটসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে স্বামীজী নিজেকে এক সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে এই ধর্মের এক বিদ্রোহী সন্তান, আর খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গেও এর যোগাযোগ আছে। ইউরোপের লোকেরা ধর্ম বুঝতে পারে না, কেননা তারা বিলাসে মত্ত।

বেলগাঁও

কোলাহাপুর থেকে বেলগাঁও। এখানে স্বামীজী এক মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকের বাড়িতে ওঠেন। ভদ্রলোক স্বামীজীকে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু কোলাহাপুরের ম্যানেজারের দেওয়া পরিচয়পত্র দেখে। তাই বলে নিজেও স্বামীজীকে যাচাই করতে ছাড়েননি। এমনকি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ডেকে এনেও পরীক্ষা করিয়েছিলেন কতটা বিদ্বান ও মহৎ তাঁর অতিথি।

স্বামীজীও ছিলেন তেমনি আশ্চর্য মানুষ। যে বিষয়েই আলোচনা হোক না কেন তাতে নতুন আলোকপাত তিনি করবেনই। তুমুল তর্কেও প্রসন্নতা হারাবেন না, ধীর-স্থির থাকবেন। স্বামীজীর বিচারের ধারা একদিকেই ধাবিত হতো। তিনি সকলের মনে এই বিশ্বাসই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যে ভারতবাসীরাও বিদেশীদের দেখিয়ে দেবে যে হিন্দুধর্ম কখনই মরে যাবে না। তবে তাঁর ক্ষোভ হতো বেদান্তের শাশ্বত ভাবগুলো যা মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস, সেগুলো তেমন করে প্রচার করা হয়নি। বিশেষ বিশেষ ভাব এক এক সম্প্রদায়ের সম্পত্তিরূপে গণ্য হচ্ছে।

উকিল সাহেবের বাড়ি থেকে হরিপদ মিত্র মশাই স্বামীজীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী একত্রে স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নেন। হরিপদবাবু স্ত্রীকে একসময় বলেছিলেন, তাঁরা

এমন গুরু করবেন যাঁর পায়ে শ্রদ্ধাভরে মাথা নোয়াতে প্রাণ চাইবে। স্বামীজীর সঙ্গে থেকে তাঁরা বুঝেছিলেন তাঁদের গুরু এমন পুরুষই হতে পারেন। হরিপদবাবু স্বামীজীর একটা ফটো তুলে রেখে দেন। এখানেও স্বামীজীর মনে চিকাগো ধর্মসভায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ হয়ে পড়ে। হরিপদবাবু তৎক্ষণাৎ চাঁদা তোলা শুরু করতে চাইলেন। কিন্তু স্বামীজী তাঁকে বাধা দিলেন।

আট দিন হরিপদবাবুর বাড়িতে কাটিয়ে নবম দিনে স্বামীজী বিদায় নিলেন। তিনি মেল ট্রেনে চড়ে মার্মাগোয়া যাত্রা করলেন। যাত্রার সময় হরিপদবাবু স্বামীজীকে প্রণাম করে জানালেন, জীবনে তিনি এমনভাবে প্রাণ ভরে কাউকে প্রণাম করেননি। আজ স্বামীজীকে প্রণাম করে কৃতার্থ হলেন।

গোয়া

গোয়ায় পৌঁছে স্বামীজী কয়েকটি গ্রাম ও মন্দির দর্শন করে ট্রেনে ধারবাড় যান। গোয়ায় তিনি যে বাড়িতে ছিলেন এখনও সেই ঘরটি পবিত্রভাবে রাখা আছে। যাঁর বাড়ি সেই নায়েকজী স্বামীজীর একটা বিরাট ফটো তাঁর দেবতা দামোদরজীর মন্দিরে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। পরে তিনি সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী সুব্রহ্মণ্যানন্দ তীর্থ নাম নেন। স্বামীজীর সেই কক্ষেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

দক্ষিণ ভারতে

মহীশূর

গোয়া থেকে স্বামীজী এলেন ব্যাঙ্গালোরে। এখানে তিনি এক নীচু জাতির মেডিক্যাল অফিসারের বাড়িতে ছিলেন বলে ভদ্র সমাজ তাঁর সঙ্গে কথাই বলত না। কিন্তু আগুন কতদিন আর ছাই চাপা থাকে! কিছু কিছু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতেই স্বামীজী স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। খ্যাতি প্রচার হতে হতে একদিন রাজ্যের দেওয়ান শ্রীযুক্ত কে ও শেষাদ্রি আয়ারের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল স্বামীজীর। দু-এক কথাতেই দেওয়ানজীর মানসপটে স্বামীজীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি ফুটে উঠল, তিনি বুঝলেন, এই সন্ন্যাসী নিশ্চয় ইতিহাসের পাতায় চিহ্ন রেখে যাবেন। স্বামীজী আয়ারের গৃহে তিন-চার সপ্তাহ থেকে গেলেন।

এই সময় স্বামীজীর সঙ্গে মহীশূরের বহু গণ্যমান্য লোক ও রাজদরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা পরিচিত হন। তাঁরা সবাই ভাবতেন, এ যুবক ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। দেওয়ানজী ভাবলেন এমন আচার্য পেলে মহারাজের অনেক উন্নতি হবে। তাই তিনি মহারাজ শ্রীচামরাজেন্দ্র উদীয়ারের সভাগৃহে স্বামীজীকে সসম্মানে নিয়ে গেলেন। তরুণ সন্ন্যাসী অতি সাধারণ গেরুয়া কাপড় পরা, অথচ আকৃতি ও চলনভঙ্গিতে রাজার মতো গম্ভীর ও আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন। মুখে সরলতা ভরা। প্রতিভার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। স্বামীজী রাজকীয় অতিথির মর্যাদা পেলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও ধর্মের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মহারাজের মন আনন্দে ভরে গেল। এরপর থেকে মহারাজ স্বামীজীকে সর্বদা কাছে কাছে রাখতেন আর তাঁর পরামর্শ নিতেন।

একবার সভাসদ্‌দের সামনেই মহারাজা স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর সভাসদ্‌রা কেমন। স্বামীজী উত্তর দিলেন—মহারাজ আপনি স্বয়ং হৃদয়বান, অতি সুন্দর, কিন্তু আপনি এত সভাসদ্ পরিবৃত হয়ে থাকেন কেন? এরা তো সবাই খোসামুদে। ভেতরে ভেতরে আপনার ধন সরিয়ে ইংরেজ প্রতিনিধিকে দান করছে। স্বামীজীর স্পষ্ট কথা শুনে মহারাজ তখনকার মতো চুপ করে রইলেন। কিন্তু পরে গোপনে স্বামীজীকে সাবধান করে দিলেন, এমন স্পষ্টবাদিতা আপনার বিপদ ডেকে আনতে পারে। ভয় হয় কেউ না আপনার খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়!

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, প্রাণের ভয়ে তিনি রেখে-ঢেকে কথা বলতে পারবেন না।

এমন স্পষ্ট বক্তা হলেও স্বামীজী মহারাজের গুণগ্রাহী ছিলেন। মহারাজের অসাক্ষাতে তাঁর গুণগানে পঞ্চমুখ ছিলেন। রাজসভায় নানান ধর্মের লোক আসত। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আলোচনায়ও স্বামীজী পিছপাও হতেন না। বৈদ্যুতিক রহস্যও তাঁর অধিগত ছিল। এক মুসলমান ভদ্রলোকের কোরানের অংশবিশেষ নিয়ে সংশয় ছিল। স্বামীজী ঐ সমস্যার এমন সুন্দর সমাধান করে দিলেন যে ভদ্রলোকটি কৃতার্থবোধ করলেন।

স্বামীজীর প্রতি অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হয়ে প্রধান অমাত্য তাঁকে কোনো উপহার নিতে অনুরোধ করে বাজারে পাঠালেন। শিশুর মতো স্বভাব স্বামীজীর। তিনি এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে ভাল ভাল জিনিস দেখছেন আর প্রশংসা করছেন। কিন্তু কিছুই চাইছেন না। শেষে যে সঙ্গে এসেছিল সে জোড়হাত করে স্বামীজীকে অনুনয় বিনয় করে বলল কিছু নিতে। নাহলে অমাত্য ভাববেন সে তার কর্তব্য পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। লোকটির অসহায় অবস্থা দেখে স্বামীজী তখন একটা চুরুট কিনে নিলেন। আর রাজবাড়িতে ফিরে এসে এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন কি মূল্যবান সম্পদ আহরণ করে এনেছেন, বহু ভাগ্য করলে এমনটি পাওয়া যায়। প্রধান অমাত্য সব শুনে সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যে চমৎকৃত হলেন।

মহারাজ নিজেও চাইছিলেন স্বামীজীর জন্যে কিছু করতে। এই উদ্দেশ্যে স্বামীজীকে একদিন নিজের ঘরে নিয়ে এসে তাঁর মনের কথা জানালেন। সেখানে দেওয়ানজীও উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী সব শুনে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মহারাজকে বুঝিয়ে বললেন। এও জানালেন যে রামেশ্বর দর্শনের আগে তিনি কিছুই ঠিক করবেন না। চিকাগো যাওয়ার অর্থও তিনি নেবেন না। চিকাগোর ব্যাপারে স্বামীজী মনে করতেন যে এমন মহৎ কাজে গেলে কোনো একজন ব্যক্তির টাকায় যাবেন না। সর্বসাধারণের অল্প অল্প দানে একটা তহবিল হবে।

স্বামীজীর স্মৃতি হিসাবে মহারাজ স্বামীজীর কণ্ঠস্বর তাঁর শখের ফোনোগ্রাফে ধরে রেখেছিলেন। আজও মহীশূরের রাজপ্রাসাদে রাখা আছে। তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্যে কিছু নিতে বললে স্বামীজী প্রথমে রাজী হন না। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর তামাক খাওয়ার জন্যে স্বামীজী একটা হুঁকা চেয়ে নেন।

(চলবে)

ছবি : বিজন কর্মকার

জাম্বিয়া ফুটবল দল— বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন এঁদের অনেকেই

বিনা মেঘে বজ্রপাত

শা. প্রি. ব.

খেলোয়াড়রা যখন একসঙ্গে কোথাও যান তখন তাঁরা কিরকম হৈচৈ করতে করতে যান তা কল্পনাও করা যায় না। কেউ গান ধরেন, কেউ গল্প করেন আবার কেউ কেউ চুটিয়ে আড্ডা মারেন। দলে স্থান পাওয়ার ব্যাপারে যাঁরা নিশ্চিত নন তাঁরা শুধু চুপচাপ থাকেন। আসলে তাঁরা ভোগেন প্রচণ্ড টেনশানে। তবু যাত্রাপথে মজাই হয়। আজকাল প্লেনে খেলোয়াড়রা যাওয়া-আসা করেন বলে ঠিক ততোটা হৈ-হুল্লোড় হয় না। তবু আনন্দেই কাটে তাঁদের সময়।

ঐ রকম আনন্দ করতে করতেই জাম্বিয়া ফুটবল দলের সতেরো জন খেলোয়াড় সেনেগাল যাচ্ছিলেন বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে খেলতে। জাম্বিয়ার বায়ু সেনাবাহিনীর ঐ বিমানটি গ্যাবনের কাছে অতলান্তিক সমুদ্রে ভেঙে পড়লে তিরিশ জন আরোহীর সকলেই মারা যান। ঐ বিমানে ছিলেন জাম্বিয়ার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় উইসডম চান্সা, স্যামুয়েল চোম্বা আর গোলরক্ষক ডেভিড এফোর্ড চাবালা। ঐ বিমানে না থাকায় বেঁচে গেছেন জাম্বিয়ার সেরা খেলোয়াড় কালুসা, জনস্টন বাইলা, মুসোন্ডা, গিবি বাসেলা, বেস্টন চামবেশি, কেনিথ মালিতলি। তাই জাম্বিয়া দলটি একেবারে শেষ হয়ে গেছে এ কথা বলা যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা বড় দুঃখের। বিমান দুর্ঘটনায় খেলোয়াড়দের মারা যাবার ঘটনা কিন্তু নতুন কিছু নয়। এই রকমই এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ববি চার্লটনের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আটজন খেলোয়াড় প্রাণ

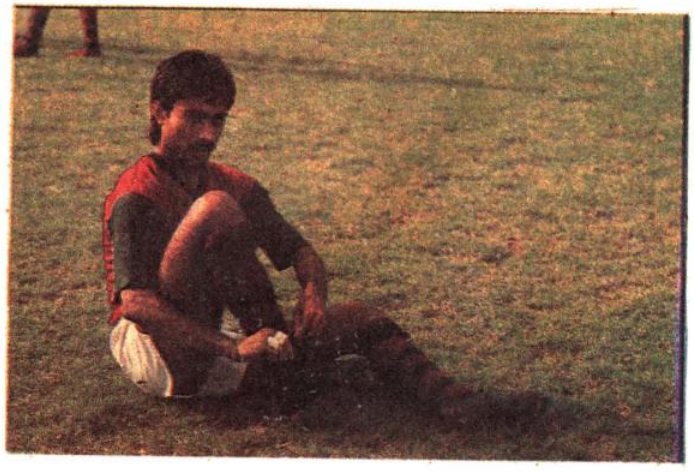

সত্যজিৎ

তনুময় বসু

হারিয়েছিলেন। বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছিলেন ববি চার্লটন। ১৯৪৯ সালে আর এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন ইতালির তুরিন দলের ২৮ জন ফুটবল খেলোয়াড়। ১৯৮৭ সালে সুরিনামে একটি বিমান ভেঙে পড়ায় প্রাণ হারিয়েছিলেন হল্যান্ড দলের ১৩ জন ফুটবল খেলোয়াড়।

জাম্বিয়ার পক্ষে এই আঘাত বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। জাম্বিয়া অবশ্য জানিয়েছে, তারা বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে যথারীতি খেলবে। তবে এই প্রচণ্ড আঘাতের পর তাদের পক্ষে আবার উঠে দাঁড়ানো একটু মুশকিলই হবে।

এদিকে তো আবার কলকাতার ফুটবলের হাল এবার শোচনীয়। লীগের খেলা যে কবে আরম্ভ হবে কে জানে। দলবদলের সময় পিছোতে পিছোতে একেবারে জুন মাসে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যবার মে মাসের মাঝামাঝির পরই লীগ ফুটবল শুরু হয়। মের একেবারে শেষে আর জুনের গোড়ায় মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান একে একে মাঠে নামে। তারপরই গড়ের মাঠ গমগম করে ওঠে। আর তার অনেক আগে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসেই দলবদলের পালা সারা হয়ে যেতো। কোচরা খেলোয়াড়দের নিয়ে রোজ ভোরবেলায় মাঠে নেমে পড়তেন। চলতো টানা প্র্যাকটিশ। হতো এখানে ওখানে দু চারটে প্র্যাকটিশ ম্যাচ। সবই ছিলো লীগের প্রস্তুতি। সেই সঙ্গে বিল্টু-মন্টু, নন্টে-ভন্টের তর্ক আর ঝগড়ায় স্কুল আর পাড়ার আসর জমে উঠতো। ওরা কোন দল কেমন হয়েছে তার চুলচেরা হিসেব করতো। সেইসঙ্গে কোচ পি. কে. ব্যানার্জি কিংবা অমল দত্ত কি বলেছেন তাই নিয়ে চলতো হৈচৈ। লীগ ফুটবলের একটা আলাদা মজা, আলাদা আনন্দ ছিলো। কিন্তু এবার সব গোলমাল হয়ে গেলা। কবে যে দলবদল হবে, তারপর কবে হবে প্র্যাকটিশ, তারপর টিম সেট করে কবে যে বিল্টু-মন্টুর মোহনবাগান, নন্টে-ভন্টেদের ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান স্পোর্টিং মাঠে নামবে কে জানে! মহীন্দ্র-মহীন্দ্রকে হারিয়ে মোহনবাগান ফেডারেশন কাপ জেতায় যে আনন্দ ওদের হয়েছিল তা এখন আর নেই। লীগের খেলা শুরু না হলে কি আর ভালো লাগে? সেজদাদুকে রাজী করিয়ে ওরা শঙ্করকাকুর সঙ্গে এক-আধদিন খেলা দেখতে যেতো তো! এবার কি হবে কে জানে! এবার অবশ্য দুর্গাপুজো অক্টোবর মাসের শেষে। তাই লীগের খেলা যদি অক্টোবর অবধি গড়ায় তাহলেও বলার কিছু থাকবে না। শুধু ক্রিকেটের পিচ তৈরির জন্যে ফুটবলকে মাঠ ছেড়ে দিতে হবে এই যা।

ওরা অবশ্য ফুটবল নিয়ে খুব একটা কিছু বলে না। ফুটবলের কথা শুনলে সেজদাদু চটে যান। বলেন, এখনকার কর্তাদের হাতে পড়ে কলকাতার ফুটবল গোল্লায় যাচ্ছে। তা নাহলে এখনো লীগের খেলা শুরুই হলো না! গত বছর তো ফালতু আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। সেজদাদু তাই এখন বিদেশের ফুটবল খেলার কথা বলেন। আসছে বছর

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসবে আমেরিকায়। মারাদোনা বিশ্বকাপে কেমন খেলবেন তাই নিয়ে আলোচনা করেন সেজদাদু। মার্কোভ্যান বাস্তেন তাঁর ডান পায়ের কার্টিলেজ অপারেশনের পর আবার এ. সি. মিলানের পক্ষে খেলতে শুরু করেছেন। বাস্তেন গত ডিসেম্বর মাসের পর আর খেলেননি। এ বছর মে মাসের ৯ তারিখে তিনি আবার মাঠে ফিরে এসেছেন। গত বছর এ. সি. মিলান লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলো। এবারও তারা সেই স্বপ্ন দেখছে। সেইজন্যেই বাস্তেনকে তাদের বড় দরকার। কারণ গতবারের অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে হল্যান্ডের আঠাশ বছর বয়স্ক এই খেলোয়াড়টির অবদান ছিলো সবথেকে বেশি।

ওদিকে বলের রাজা পেলেকে নিয়ে আমেরিকায় খুব হৈচৈ চলছে। তাঁকে আমেরিকার 'হল অফ ফেম' সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। পেলেকে দিয়ে আমেরিকা তাদের দেশে বিশ্বকাপের প্রচার করাবে। কারণ আমেরিকার মানুষ পেলেকে ভালোবাসেন। পেলেই আমেরিকায় ফুটবল খেলা জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। ১৯৭৫ সালে ৪০ লক্ষ ৭০ হাজার ডলার নিয়ে পেলে যখন আমেরিকার কসমস ক্লাবে যান তার আগে রোজ মাত্র হাজার পাঁচেক দর্শক খেলা দেখতে আসতেন। কিন্তু পেলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় রাতারাতি সেই দর্শকসংখ্যা ষাট হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। শুধু তাই নয় কোকাকোলা কোম্পানির হয়ে পেলে আমেরিকার ছোট ছোট ছেলেদের ফুটবল খেলাও শিখিয়েছিলেন। তাঁদেরই অনেকে এখন আমেরিকার নামকরা খেলোয়াড়। তাই বিশ্বকাপের উদ্যোক্তারা ঠিক করেছেন গোটা আমেরিকা জুড়ে বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রচারের দায়িত্ব তাঁরা পেলের ওপরই দেবেন। কারণ বাস্কেট আর রাগবি নিয়ে মেতে থাকা মার্কিন জনগণ যদি বিশ্বকাপের খেলা দেখতে না আসেন তাহলে যে তাঁদের লজ্জার সীমা থাকবে না।

পেলে যে কতো বড় খেলোয়াড় ছিলেন তা তো আমরা সকলেই জানি। তিনিই বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়। গত বছর মারাদোনা যখন সাসপেন্ড ছিলেন এবং ভাবছিলেন ফুটবল খেলা ছেড়ে দেবেন তখন পেলে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে মাঠে ফিরে আসার জন্যে উৎসাহ দিয়েছিলেন। মারাদোনাকে পেলে বলেছিলেন, খেলা ছেড়ে দেবার কথা একদম ভাববে না। মনে রেখো ফুটবলের তোমাকে এখনো দরকার আছে। তোমাকে খেলতেই হবে। পরে মারাদোনা বলেছেন, পেলের দেওয়া উৎসাহই তাঁকে মাঠে ফিরিয়ে এনেছে। পেলের জন্যই তিনি নতুন উদ্যমে প্র্যাকটিশ শুরু করেছিলেন, জোর পেয়েছিলেন মনে।

পেলে ১৩২৪টি ম্যাচ খেলে ১২৮২টি গোল করেছেন তাঁর খেলোয়াড় জীবনে। এর মধ্যে হ্যাটট্রিক করেছেন ৩১ বার। পেলের কৃতিত্বের জন্যেই ব্রাজিল ১৯৫৮, ১৯৬২ আর ১৯৭০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে জুলে রিমে কাপ বরাবরের জন্যে পেয়ে গিয়েছিলো। বিশ্বকাপ ফুটবলে পেলে মোট ১২টি গোল করেছেন। এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য আমেরিকার সকার ফেডারেশন পেলেকে 'হল অফ ফেম' সম্মান দিচ্ছে।

বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার

এখন যদি বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডারদের একটা তালিকা তৈরি করা হয় তাহলে কাদের নাম থাকবে? কারা সেরা সেই বিচারও বা কিভাবে হবে? ব্যাটিং আর বোলিং দুটি বিভাগেই যাঁরা চৌখস তাঁরাই তো অলরাউন্ডার।

কপিলদেব

দেবাশিস মুখার্জি

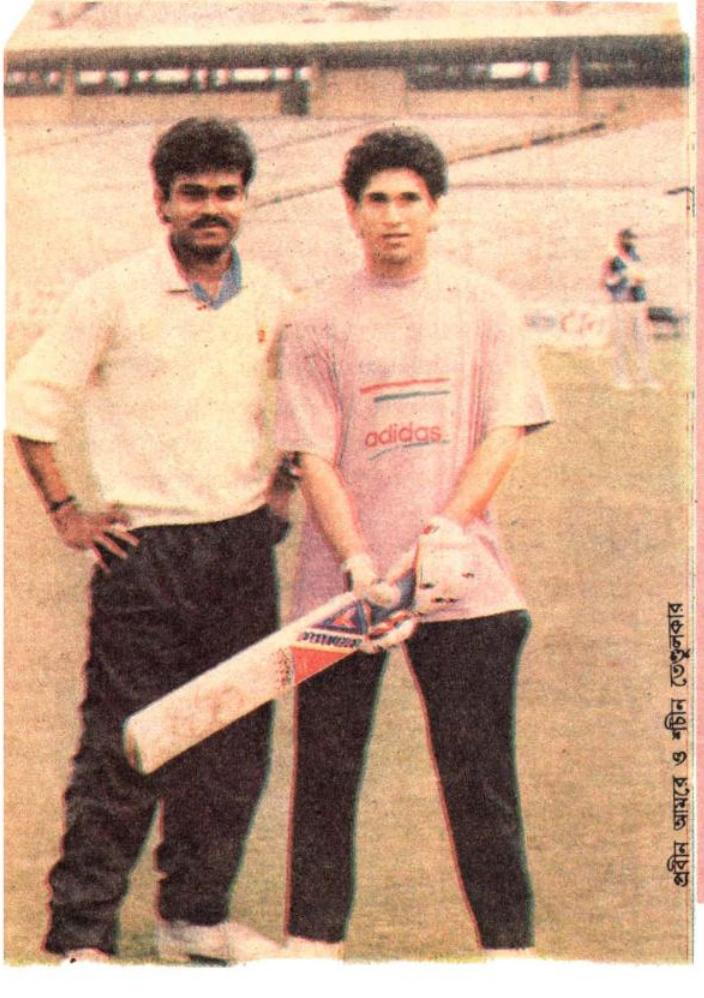

প্রবীন আমরে ও শচীন তেন্ডুলকার

একজন খেলোয়াড় এক হাজার রান আর একশ উইকেট দখল করলে তিনি ডবল পেয়েছেন বলা হয়। আমরা যদি ডবল পেয়েছেন যাঁরা তাঁদেরই সেরা অলরাউন্ডারের তালিকায় ফেলি তাহলেও বেশি নাম পাবো না। টেনেটুনে মাত্র ২৮ জনকে এই তালিকায় ফেলা যাবে। কিন্তু সেরা অলরাউন্ডার বলতে যা বোঝায় তাঁদের অনেকেই কিন্তু তা নন। বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার বলতে আমরা বুঝি কপিলদেব, রিচার্ড হ্যাডলি, ইয়ান বথাম, ইমরান খান, গ্যারি সোবার্স, রিচি বেনো, কিথ মিলার, ট্রেভর বেইলি, ভিনু মানকড়, অ্যালান ডেভিডসনের মতো খেলোয়াড়কে। যাই হোক নিচে বিশ্বের অলরাউন্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হলো। যাঁরা হাজারের ওপর রান করেছেন এবং একশর ওপর উইকেট পেয়েছেন তাঁরাই আছেন এই তালিকায়।

	টেস্ট	রান	উইকেট	ডবল পান যে টেস্টে
কপিলদেব (ভারত)	১২৪	৫০৬৯	৪২০	২৫ তম
রিচার্ড হ্যাডলি (নিউজি)	৮৬	৩১২৪	৪৩১	২৮ ,,
ইয়ান বথাম (ইংলন্ড)	১০২	৫২০০	৩৮৩	২১ ,,
ইমরান খান (পাকিস্তান)	৮৮	৩৮০৭	৩৬২	৩০ ,,
ম্যালকম মার্শাল (ওঃ ইন্ডিজ)	৮১	১৮১০	৩৭৬	৪৯ ,,
গ্যারি সোবার্স (ওঃ ইন্ডিজ)	৯৩	৮০৩২	২৩৫	৪৮ ,,
রিচি বেনো (অস্ট্রেলিয়া)	৬৩	২২০১	২৪৮	৩২ ,,
রে লিন্ডওয়াল (অস্ট্রেলিয়া)	৬১	১৫০২	২২৮	৩৮ ,,
আব্দুল কাদির (পাকিস্তান)	৫৮	৩৫৯৯	২৩৬	৩৭ ,,
রবি শাস্ত্রী (ভারত)	৮০	৩৮৩০	১৫১	৪৪ ,,
টনি গ্রেগ (ইংলন্ড)	৫৮	৩৫৯৯	১৪১	৩৭ ,,
কিথ মিলার (অস্ট্রেলিয়া)	৫৫	২৯৫৮	১৭০	৩৩ ,,
টেভর গর্ডাড (দঃ আফ্রিকা)	৪১	২৫১৬	১২৩	৩৬ ,,
উইলফ্রেড রোডস (ইংলন্ড)	৫৮	২৩২৫	১২৭	৪৪ ,,
ট্রেভর বেইলি (ইংলন্ড)	৬১	২২৯০	১৩২	৪৭ ,,
ভিনু মানকড় (ভারত)	৪৪	২১০৯	১৬২	২৩ ,,
মন্টি নোবল (অস্ট্রেলিয়া)	৪২	১৯৯৭	১২১	২৭ ,,
রে ইলিংওয়ার্থ (ইংলন্ড)	৬১	১৮৩৬	১২২	৪৭ ,,
জন এমবুরি (ইংলন্ড)	৬২	১৬১৩	১৪৪	৪৬ ,,
ইন্তিখাব আলম (পাকিস্তান)	৪৭	১৪৯৩	১২৫	৪১ ,,
ফ্রেড টিটমাস (ইংলন্ড)	৫৩	১৪৪৯	১৫৩	৪০ ,,
অ্যালান ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া)	৪৪	১৩২৮	১৮৬	৩৪ ,,
জর্জ গিফেন (অস্ট্রেলিয়া)	৩১	১২৩৮	১০৩	৩০ ,,
এম টেট (ইংলন্ড)	৩৯	১১৯৮	১৫৫	৩৩ ,,
সরফরাজ নওয়াজ (পাকিস্তান)	৫৫	১০৪৫	১৭৭	৫৫ ,,
ওয়াসিম আক্রাম (পাকিস্তান)	৪৫	১০১৩	১৭৭	৪৫ ,,
জন ব্রেসওয়েল (নিউজি)	৪১	১০০১	১০২	৪১ ,,
ইয়ান জনসন (অস্ট্রেলিয়া)	৪৫	১০০০	১০৯	৪৫ ,,

গল্প হলেও সত্যি

অনেক দিন আগের কথা।

ইংরেজরা তখন চুটিয়ে ভারতে রাজত্ব করছে। তবে তাদের প্রথম ধাক্কা খেতে হয়েছে মোহনবাগানের কাছে। ১৯১১ সালে আই. এফ. এ. শীল্ডের ফাইনালে ফৌজি দল ইস্ট ইয়র্ককে হারিয়ে মোহনবাগান সারা দেশে এনে দিয়েছে নতুন উন্মাদনা। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন মোহনবাগানের সাফল্যে। তাঁরা জোর গলায় বলতে শুরু করেছেন, খেলার মাঠে আমরা যদি সাহেবদের হারাতে পারি তাহলে কেন পারবো না দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের লড়াইএ ?

তা তখন কলকাতার নবযুবকরা একটু অন্যরকম ছিলেন। জল দেখলেই সাত হাত দূরে সরে যেতেন তাঁরা। সাঁতার-টাঁতার কাটা শেখার ধার ধারতেন না। তারপরই ঘটলো সেই ঘটনা যা বদলে দিয়েছিলো বাঙালী তরুণদের জীবনধারা। ১৯১২ সালের ১৯ নভেম্বর ওয়াই. এম. সি.-এর একদল তরুণ সদস্য শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। সারাদিন তাঁদের কাটলো হৈচৈ করে। বিকেল গড়িয়ে যেতেই ঘরে ফেরার জন্য ওঁরা চড়ে বসলেন নৌকোয়। কিন্তু ঘরে আর তাঁদের ফেরা হলো না। মাঝগঙ্গায় নৌকো উল্টে গেলো। প্রাণ হারালেন সতীশচন্দ্র ব্যানার্জি, অরবিন্দনাথ সেন, রমণীমোহন সেনগুপ্ত, সনৎকুমার গুপ্ত, প্রকাশচন্দ্র মিত্র ও পি সীতারাম শাস্ত্রী।

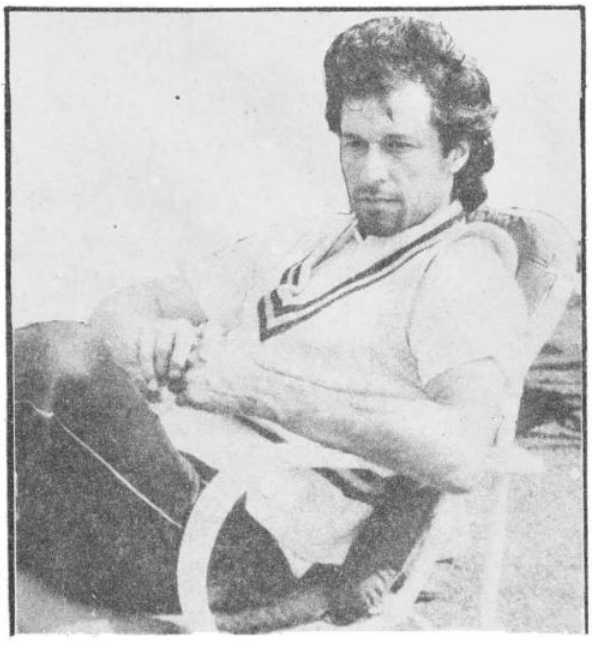

সারা কলকাতায় সেদিন নেমে এসেছিলো শোকের ছায়া। কলকাতা তখন আজকের মতো এতো বড় ছিলো না। তাছাড়া এখানে ওখানে অনেক পুকুর-টুকুরও ছিলো তখন। ছটি অমূল্য প্রাণ চলে যাওয়ায় কলকাতার মানুষ নড়ে বসলেন। শুরু হলো 'সাঁতার শেখো' আন্দোলন। সেই অন্দোলনে যোগ দিলেন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, হরিধন দত্ত, ওয়াই. এম. সি.-এর ক্রীড়া সচিব ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্রীড়াশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ গ্রে, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চিফ ভ্যালুয়ার ব্রুসবেরি আর বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তুলসীচরণ রায়।

ইমরান খান

হ্যাডলি

এঁদের উদ্যোগে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সঙ্গীত সমাজে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম সভা। কলকাতা শহরের ছেলেদের সাঁতার শেখার প্রয়োজনীয়তার কথায় বক্তারা জোর দিলেন। সেই সভাতেই প্রতিষ্ঠিত হলো ক্যালকাটা সুইমিং অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। কলকাতার ছেলেদের সাঁতার শেখাবার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হলো তাঁদের হাতে। সেই সঙ্গে যে ছটি অমূল্য প্রাণ গঙ্গার গ্রাসে গেছে তাঁদের নাম উল্লেখ করে বঙ্গ-সন্তানদের টেনে আনা হলো সাঁতার শেখার আসরে। প্রত্যেক পরিবারের বাবা-মারাই তাঁদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতে শুরু করলেন সাঁতার শেখানোর জন্য। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা সাঁতারে সারা ভারতের শীর্ষস্থান লাভ করলো। ১৯১৩ সালে গোলদীঘিতে প্রথম সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। হাজার হাজার দর্শক টিকিট কেটে সেই প্রতিযোগিতা দেখতে গিয়েছিলেন। টিকিট বিক্রি হয়েছিলো কয়েক হাজার টাকার। আজ স্তু সে কথা ভাবাও যায় না।

উক্তি

আমার মনে হয় ইংলন্ড সফরের জন্যে দল গড়তে গিয়ে অস্ট্রেলিয়া দু চারটে বেশ ভালোরকম ভুল করে ফেলেছে।

—রবিন স্মিথ

(অস্ট্রেলিয়া দল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে)

ইভান লেন্ডল ভারী মজার খেলোয়াড়। সাজঘরে ওঁর মতো মজার মানুষ হয় না। কিন্তু কোর্টে নামলেই উনি অন্যরকম। তখন খেলা ছাড়া উনি আর কিছুই বোঝেন না।

—টনি রোচে

(সম্প্রতি কলকাতায় এক সাক্ষাৎকারে)

ভাবতেই পারিনি আমার ওপর আবার ইংলন্ড দল পরিচালনার ভার পড়বে। আমি দারুণ খুশি। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার সময় আপ্রাণ চেষ্টা করবো ভারতের দুঃস্বপ্নের দিনগুলো ভুলে যেতে।

—গ্রাহাম গুচ

(ইংলন্ড দলের অধিনায়ক মনোনীত হবার পর)

পরপর দুটো খেলায় ডবল সেঞ্চুরি করার পর আমায় আজ নিশ্চয়ই কেউ আর শচীন তেন্ডুলকারের পার্টনার বলবেন না। আমি বিনোদ কাম্বলি। এই আমার পরিচয়।

—বিনোদ কাম্বলি

(সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে)

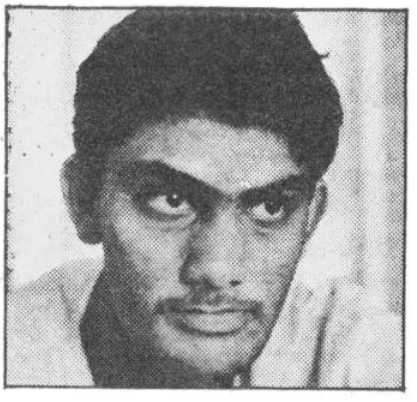

ভারত যে ঘুরে দাঁড়াতে পারে তার প্রমাণ আমরা দিয়েছি। আশা করি আমরা আমাদের খারাপ সময় কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।

—মহম্মদ আজহারউদ্দিন

(জিম্বাবুয়েকে হারাবার পর এক সাক্ষাৎকারে)

তোমাদের জিজ্ঞাসা

সুচিত্রা নাথ (কালাচুপ, করিমগঞ্জ, অসম ৭৮৮১৬৬)

প্রশ্নঃ আমি স্টেফি গ্রাফের ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তরঃ জার্মান টেনিস ফেডারেশনের নামে চিঠি লিখলে স্টেফি পেয়ে যাবেন। অথবা উইম্বলডনের সময় c/o উইম্বলডন, ভায়া লন্ডন, ইংলন্ড—এই ঠিকানায় লিখলেও স্টেফি পেয়ে যাবেন।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (কলকাতা-৩৯)

প্রশ্নঃ আগামী বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় মারাদোনা কি খেলবেন? কোথায় হবে ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপের খেলা?

উত্তরঃ হ্যাঁ খেলবেন। আমেরিকায়।

দীপা দত্ত (c/o বীরেন দত্ত, দুর্গাপুর-১০)

প্রশ্নঃ আমি অনিল কুম্বলে, শ্রীনাথ ও বিনোদ কাম্বলির ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তরঃ ওঁদের নিজের নিজের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ঠিকানায় চিঠি লিখলেই ওঁরা পেয়ে যাবেন।

অর্ঘ্য চট্টখণ্ডি (আন্দুল দক্ষিণ পাড়া, হাওড়া)

প্রশ্নঃ ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা কার দায়িত্বে হয়?

উত্তরঃ যে দেশে খেলা হয় সেই দেশের ফুটবল ও ক্রিকেট সংস্থার দায়িত্বে।

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্নঃ

(১) টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ উইকেট ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে মাত্র একজনই স্পিনার। তার নাম কি?

(২) অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে টেস্টে জিম লেকার ১৯টি উইকেট পেয়েছিলেন সেই টেস্টে বাকি উইকেটটি কার দখলে গিয়েছিলো?

(৩) মাত্র একজন খেলোয়াড়েরই দখলে আছে একদিনের ক্রিকেটে সেঞ্চুরি ও হ্যাটট্রিক করার গৌরব। তিনি কে?

(৪) ক্রিকেট খেলার সময় মহিন্দর অমরনাথের পকেটে সব সময় একটা লাল রুমাল থাকতো। কিন্তু নীল রুমাল কে রাখতেন?

(৫) ভারতের কোন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়কে রিটার্নিং মেশিন বলা হতো?

উত্তরঃ
(১) ল্যান্স গিবস।
(২) টনি লকের।
(৩) ভারতের চেতন শর্মা।
(৪) ওয়ালটার হ্যামন্ড।
(৫) দীনেশ খান্নাকে।

নতুন প্রস্তাব

শুনতে অবাক লাগে কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। ফুটবল খেলা থেকে থ্রো ইন প্রথা তুলে দেবার কথা হচ্ছে। ফিফার বিগত সভায় এই প্রস্তাবটা উঠেছে। তবে চূড়ান্ত কিছু হয়নি। ফুটবল খেলাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে থ্রো ইন তুলে দিয়ে সেখানে কিক ইন হবে। অর্থাৎ থ্রোর বদলে কিক। ব্যাপারটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। সত্তরের দশকে ইংলন্ডে কিছু খেলায় এই প্রথা চালু হয়েছিলো। বলের রাজা পেলেও চাইছেন থ্রোর বদলে কিক হোক। পেলের মতে এতে সময় বাঁচবে, গোলের সংখ্যাও বাড়বে। পেলে ফুটবল খেলার উন্নতির জন্য ফিফার কাছে কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। তাতে থ্রোর বদলে কিক ইনের ব্যাপারটাও আছে। পেলের মতে ফুটবল খেলার কিছু নিয়মের পরিবর্তন এখনই করা দরকার। কিক ইন ছাড়াও পেলে দুই পোস্টের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর মতে এতে গোলের সংখ্যা বাড়বে। ফুটবল ম্যাচে গোল দিন দিন কমে যাচ্ছে। অথচ খেলাটিকে আকর্ষণীয় করে রাখতে হলে গোলের সংখ্যা বাড়াতেই হবে। কারণ দর্শকরা গোল দেখতে মাঠে যান।

থ্রোর বদলে কিক ইনের ব্যাপারটা আগামী আগস্ট মাসেই চালু হয়ে যাচ্ছে। জাপানে ঐ সময় অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। সেই প্রতিযোগিতায় কিক ইন পরীক্ষামূলকভাবে চালু হবে। তবে ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আগে ফিফা এই নিয়মটি বড়দের খেলায় চালু করছে না।

কিক ইন নিয়ে কি কম ঝামেলা চলছে? সকলে এই ব্যাপারে রাজী নন। ইংলন্ডের ফুটবল কোচরা তো তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে কিক ইন চালু হলে পেনাল্টি অঞ্চলে উঁচু সেন্টারের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। তাতে ফুটবল খেলার আকর্ষণ অনেক কমে যাবে।

শুধু থ্রো ইনের বদলে কিক ইনই নয়, একটি ম্যাচ দুজন রেফারি দিয়ে পরিচালনা করার প্রস্তাবও উঠেছে। একটি নব্বই মিনিটের খেলা ঠিকঠাকভাবে পরিচালনা করতে হলে একজন রেফারিকে অন্তত ১২ কিলোমিটার দৌড়তে হয়। ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। এ থেকেই বোঝা যায় একজন রেফারির ওপর তাহলে কতোটা চাপ পড়ে। এই চাপ কমাবার জন্য এবং খেলা আরো দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করার জন্যেই দুজন রেফারির প্রস্তাব উঠেছে। দুই প্রান্তে দুজন রেফারি থাকলে দুজনেরই সুবিধে হবে। কারো ওপর বেশি চাপ পড়বে না। ইংলন্ডে এক সময় কিছু খেলা দুজন রেফারি দিয়ে পরিচালনা করা হয়েছিলো। তাই ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। ফিফার কাছে ফুটবল খেলার নিয়ম বদলের জন্য যে সব প্রস্তাব এসেছে তার মধ্যে এই দুজন রেফারি দিয়ে খেলা পরিচালনা করার বিষয়টাও আছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।

বিশেষ কারণে জন রেনরের ফুটবল খেলা শেখা এই সংখ্যায় ছাপা হলো না। আগামী সংখ্যায় হবে।

খেলোয়াড়

পরিতোষ চক্রবর্তী

পেলে আর মারাদোনা,
ফুটবলে তুলোধোনা
করে প্রতিপক্ষে।
পায়ে বল পেলে তারা, গোল-মুখে করে তাড়া
নেই কারো ছাড়াছাড়ি, নেই কারো রক্ষে॥

ব্রুনো আর টাইসন,
যেন দুই বাইসন;
শরীরেতে ভয়ানক শক্তি।
ঘুঁষি খেলে হাসি ভুলে
পেয়ে যাবে একেবারে মুক্তি॥

বরিস আর স্টেফি
টেনিসের ট্রফি
জিতে নিয়ে ফেরে নিজ দেশ।
মানে হার বর্গার
মানে হার চ্যাং আর সাবাতিনি, সাঞ্চেস॥

কপিল আর ইমরান,
ক্রিকেটেতে শতরান
করে চার, ছক্কায়।
ছুটে এসে বল করে,
ব্যাটস্‌ম্যান বোল্ড হয়ে ফিরে যায় ফক্কায়॥

ছবি: সুফি

ডায়নামোকিয়েভ

সুমন ভট্টাচার্য

ইগর বেলানভকে মনে আছে? ১৯৮৬তে এই সোভিয়েত স্ট্রাইকার বিশ্বকাপের খেলায় হ্যাটট্রিক করেও নিজের দলকে জেতাতে পারেননি। সোভিয়েত রাশিয়া বেলজিয়ামের কাছে হেরে যায় ৩-৪ গোলে। সেই দুরন্ত স্ট্রাইকার বেলানভ খেলতেন ডায়নামোকিয়েভ ক্লাবে।

ডায়নামোকিয়েভ হলো সোভিয়েত রাশিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত ক্লাবগুলোর একটা। এদের নিয়ে প্রথম হৈচৈ শুরু হয় ১৯৬১ সালে, যেবার তারা মস্কোয় স্থানীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নেয়। পরবর্তী দু-দশক ধরে ডায়নামোকিয়েভ ছিল সোভিয়েত ফুটবলের প্রাণস্পন্দন। রাশিয়ার ফুটবলে আধুনিকতার নতুন নতুন ধারা নিয়ে এসেছে ডায়নামোকিয়েভ। প্রথম রুশ দল হিসাবে ডায়নামোকিয়েভেই অনুসৃত হয় অত্যাধুনিক কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। শুরু করেন বিখ্যাত রুশ কোচ ভ্যালেরী লেবোনস্কি। পরবর্তীকালে লেবোনস্কি রুশ জাতীয় দলেরও দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় ফুটবলে, বিশেষ করে ক্লাবের জার্সিতে স্পনসরের লোগো ব্যবহার করাতেও এই ক্লাবই পথিকৃৎ ছিল। এদের জার্সিতে কম্পিউটার প্রস্তুতকারক কোম্পানী কমোডরের লোগো ব্যবহার নিয়ে কম বিতর্কের ঝড় ওঠেনি। ডায়নামোকিয়েভই প্রথম রাশিয়ান দল যারা পেশাদারী ফুটবলের দিকে অগ্রসর হয়।

শুধুমাত্র ফুটবল ঘরানার দিক থেকেই নয়, সাফল্যের দিক থেকেও ডায়নামোকিয়েভ সোভিয়েত রাশিয়ার ফুটবলের অন্যতম দিশারী। তারাই প্রথম রুশ দল হিসাবে কোনো ইউরোপীয় প্রতিযোগিতা জেতে। ১৯৭৫এ তারা হাঙ্গেরীর ফেরেকভারোসকে ফাইনালে পর্যুদস্ত করে ৩-০ গোলে হারায় ও প্রথমবারের জন্য জেতে ইউরোপীয়ান কাপউইনার্স কাপ। ঠিক আগের বছরই অবশ্য তারা ইউরোপীয়ান সুপার কাপ জয় করে প্রায় একই কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। সেবার তারা ফাইনালে জার্মানির বিখ্যাত বেয়ার্ন মিউনিখকে হারিয়েছিল ঐ একই ব্যবধানে ৩-০ গোলে। এই সময় ডায়নামোকিয়েভ দলের অন্যতম তারকা ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত রুশ স্ট্রাইকার ওলেম ব্লখিন। অসাধারণ ফর্মে থাকা ব্লখিন তাঁর কৃতিত্বের জন্য ইউরোপীয়ান ফুটবলার অফ দি ইয়ার নির্বাচিত হন।

১৯৭৫এ বেসলেতে জয়ের পর আবার ডায়নামোকিয়েভ-এর ভাগ্যে সাফল্য আসে দীর্ঘ ১১ বছর বাদে। এবার লিওনাতে সেই একই ইউরোপীয়ান কাপউইনার্স কাপে সেই একই ফলাফলে স্পেনের স্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে তারা হারিয়ে দেয় ৩-০ গোলে। ১৯৮৬তে তারা দ্বিতীয়বারের জন্য ইউরোপীয়ান কাপউইনার্স কাপ জেতে। এই সময়ই তাদের দলের অন্যতম তারকা ছিলেন ইগর বেলানভ। বেলানভ অবশ্য ব্লখিনের মতো ক্লাবকে ইউরোপীয়ান সুপার কাপ এনে দিতে পারেননি। ১৯৮৬তে ডায়নামোকিয়েভ ইউরোপীয়ান সুপার কাপের ফাইনালে পৌঁছলেও রোমানিয়ার স্টিউয়া বুখারেস্টের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায়। কিন্তু বেলানভ ব্লখিনের সমান কৃতিত্বের অধিকারী হন যখন ১৯৮৬তে তাঁকেও ইউরোপীয়ান ফুটবলার অফ দি ইয়ার সম্মানে ভূষিত করা হয়।

ডায়নামোকিয়েভ দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই যেহেতু জাতীয় দলে খেলতেন সেহেতু অত্যধিক খেলার ক্লান্তি অনেক সময় খেলোয়াড়দের দক্ষতার চরম সীমায় পৌঁছতে বাধা দিত। বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাবার পর অবশ্য এ সমস্যা আর ততটা নেই। ডায়নামোকিয়েভও চেষ্টা করছে আবার পূর্ণ শক্তিতে ফিরে আসতে। রাশিয়ার তথা ইউরোপের ফুটবলে তাদের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করতে।

ঘোষণা

আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের মালিক সঞ্জয় সাহা তাঁর প্রয়াত পিতামহ নিতাইলাল সাহার স্মরণে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

মৃত্যু: ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

বিষয়বস্তু

রথের মেলায়

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ ভাদ্র।
পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ছাপা হবে।
প্রথম পুরস্কার ১০০ টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০ টাকা।

সৌজন্যে: আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়
(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত) গড়িয়াহাট জংশন
১৬১এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০১৯

পড়ার সঙ্গে খেলা

বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

অরুণাভ গুপ্ত

বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যাপীঠের গেট অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকলেই মনে হয় যেন কোনো উপাসনাগারে এসে উপস্থিত হয়েছি। কত ছাত্র এখানে পড়াশুনো করছে, অথচ কোথাও এতটুকু গণ্ডগোল শোনা যাচ্ছে না। পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে এমন নিস্তব্ধ চারপাশ। মাঠ পেরিয়ে মহারাজের ঘরে ঢুকলাম। উদ্দেশ্য বলতেই সৌম্যকান্তি মহারাজ ডেকে নিলেন প্রধান ক্রীড়া-শিক্ষক বীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু আর তাঁর সহকর্মী মনোজ মাইতি ও অসিত ঘোষকে। আলোচনার ফাঁকে প্রাইমারি সেকশনের স্পোর্টস যিনি দেখাশোনা করেন সেই অরবিন্দ সর্দারও এসে উপস্থিত হলেন। শুরু হলো প্রশ্নোত্তরের পালা।

মহারাজ প্রথমেই জানালেন, 'আমরা এক বছর বাদে আমাদের স্কুলে ফুটবলে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি। আর সবচেয়ে আনন্দের কথা হলো, এই বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন ছাত্র সুখ্যাত ফুটবলার গৌতম সরকার ছেলেদের কোচিং দেবেন বলে কথা দিয়েছেন।'

মনোজ মাইতি মহারাজের কথার রেশ টেনে বলেন, 'আমাদের এখানকার ছাত্ররা আই.এফ.এ. ও রেলওয়েতে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। যদিও এই মুহূর্তে প্রশিক্ষণরত ছাত্রদের সংখ্যা বিরাট কিছু নয়, তাহলেও আশাপ্রদ তো বটেই। ফুটবলের পাশাপাশি মিশনের ছেলেরা ক্রিকেটেরও দারুণ ভক্ত। ছেলেদের এই ক্রিকেট খেলার উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে আমরা ভাবছি ফুটবলের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পও শুরু করে দেবো।'

প্রধান ক্রীড়া-শিক্ষক বীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মারফত জানতে পারলাম ফুটবল ক্রিকেট বাদে রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্ররা অ্যাথলেটিক্সেও পিছপা নয়। প্রতি বছরের মতো এবারেও স্পোর্টস কমপিটিশনে অংশ নিয়েছিল। এতে কম-বেশি বিশটি স্কুল অংশগ্রহণ করেছিল। বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন এই প্রতিযোগিতার আসরে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পায়। ক্রীড়াশিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে জানান, নবম শ্রেণীর ছাত্র সঞ্জয় অধিকারী ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ন্যাশনালে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে।

আলোচনাব ফাঁকে মহারাজ বললেন, 'আমাদের কৃতী ছেলেদের নামগুলি বলে দাও হে। ওরা উৎসাহ পাবে।'

মহারাজের নির্দেশে ক্রীড়াশিক্ষক কৃতী ছেলেদের নামগুলি বললেন—ফুটবলে সুব্রত সিনহা, অভিষেক পাল, রাকেশ ব্যানার্জি, অয়ন ব্যানার্জি উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেট ও অ্যাথলেটিক্সে অরুণ জয়সোয়াল।

জানতে চাইলাম, ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স না হয় সামলে নিলেন, কিন্তু ক্রিকেট কি করে সামলাবেন? মানে প্রচুর টাকাকড়ির ব্যাপার তো! সেক্ষেত্রে কি হবে?

মহারাজ হাসিমুখে জবাব দিলেন, 'হয়তো চাহিদার তুলনায় যৎসামান্যই হবে। তবুও মিশন থেকেই দেওয়া হচ্ছে, তখনও দেওয়া হবে।' একটু থেমে ভরাট গলায় আগের বক্তব্যের রেশ টেনে বললেন, '৬৯ থেকে মিশনে আছি। তার আগে অন্যান্য স্কুলে ছিলাম। পুরুলিয়াতে খেলাধূলার দায়িত্ব পেয়ে আমার মনে হলো পড়াশুনার সঙ্গে খেলাধূলা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিজে সব খেলা খেলতাম, ফলে অভিজ্ঞতা কাজে লেগে গেলো। ছাত্র আর অভিভাবকদের বোঝালাম খেললে পড়াশুনো নষ্ট হয় না। বরং তাজা শরীর ও মন পড়াশুনোর জন্য একান্ত আবশ্যক। তাছাড়া খেলা তোমাকে উদার করবে, পরার্থপর করবে। এই মুহূর্তে আমার এই বিদ্যাপীঠের ১১৬৩ জন ছাত্রকে আমরা এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছি। এখানে আমাদের নানান ক্রীড়ানুষ্ঠানে সুব্রত ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু, শুভংকর সান্যাল ও অলক সাহার (প্রাক্তন ছাত্র) মতো ফুটবলারদের আহ্বান করে এনেছি। উদ্দেশ্য, ছাত্ররা উৎসাহিত হোক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অভিভাবক, শিক্ষক এঁরা যদি খানিকটা এ ব্যাপারে সচেষ্ট হন তাহলে আগামী দিনে সোনা ফলবেই ফলবে।'

বেরিয়ে আসার সময় মনে মনে প্রার্থনা করলাম মহারাজের 'মিশন' যেন সফল হয়।

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

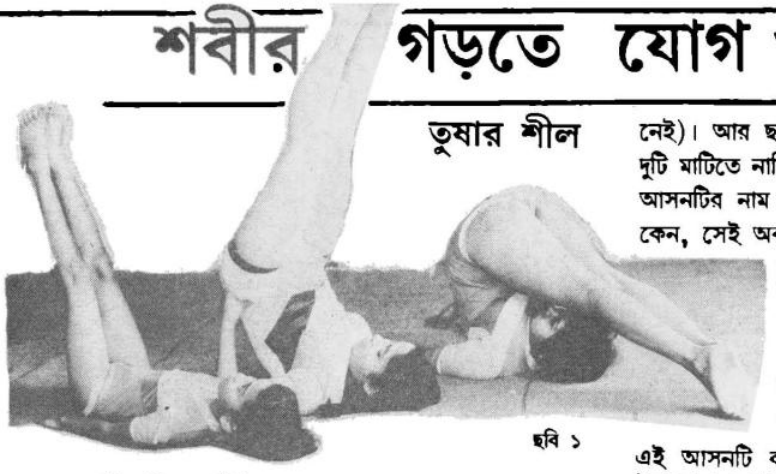

ছবি ১

বিপরীতকরণী—হলাসন—মৎস্যাসন

আজকের আসনগুলি আলোচনা করার আগে দুটি গ্রন্থির কাজ অল্প জেনে রাখা ভাল। একটি হলো পিটুইটারী গ্রন্থি, অপরটি থাইরয়েড গ্রন্থি। এই পিটুইটারী গ্রন্থির সামনের ভাগ, ডাক্তারী পরিভাষায় এন্টিরিয়ার পিটুইটারী থেকে গ্রোথ হরমোন নিঃসরণ হয়। এই হরমোনটি লম্বা কিংবা বেঁটে হওয়ার জন্য দায়ী। এ ছাড়াও এই হরমোনের অন্য অনেক কাজ আছে যা আজকের আলোচনার মধ্যে রাখছি না। পিটুইটারী থেকে কিছু অপ্রত্যক্ষ হরমোন নিঃসরণ হয় যা অন্য গ্রন্থিদের নিয়ন্ত্রণ করে। তার একটি হলো থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন অর্থাৎ থাইরয়েড গ্রন্থির নিঃসরণকে যে রস নিয়ন্ত্রিত করে। এই থাইরয়েড গ্রন্থিটি রয়েছে গলায়। থাইরয়েড গ্রন্থির নিঃসরণ কম হলে যে সব লক্ষণ দেখা যায় তার প্রথমটি হলো ছেলেবেলা থেকেই উচ্চতা বৃদ্ধি নজরে পড়ার মতো কম হয়, দ্বিতীয়টি হাড়গুলো মোটা হয় তবে লম্বা হয় না। ফলস্বরূপ দেহ হয় মোটা ও বেঁটে। এছাড়া চামড়া মোটা ও খসখসে হয়ে যায়। শরীরের ক্ষমতাও কমে যায়। ঘাড়ে মেদ জমে যায়, মুখ হয় মোটা ও থলথলে। এই কথাগুলি জানালাম এই জন্য যে আসনগুলি এই গ্রন্থিদ্বয়কে তাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে সাহায্য করে।

বিপরীতকরণী ও হলাসন আমি আগেই তোমাদের বিপরীতকরণী শিখিয়েছিলাম। আমাদের নতুন পাঠকদের জন্য আর একবার বলছি। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে জোড়া অবস্থায় পা দুটোকে ধীরে ধীরে উঁচুতে তুলতে হবে ছবির বাঁ দিকের মেয়েটির মতো। এখন দু' হাতের তালু দিয়ে পাছা ও পিঠ ঠেলে ধরে ছবির মাঝের মেয়েটির অবস্থানে আসতে হবে। কনুই থাকবে শরীরের কাছাকাছি জায়গায়। এই বিপরীতকরণী অবস্থানে কোমরটা অল্প ভাঁজ হয়ে থাকবে আর পায়ের বুড়ো আঙুল থাকবে চোখ বরাবর। কোমর যদি সম্পূর্ণ তুলে দিতে পারো আর পিঠ, কোমর ও পা এক সরলরেখায় থাকে তখন হবে সর্বাঙ্গসন, এক কথায় শরীরটা ঘাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যাবে (এই অংশের ছবি এখানে নেই)। আর ছবির ডানদিকের মেয়েটি যে ভাবে পায়ের পাতা দুটি মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে এই অবস্থানে আসতে পারলে তখন আসনটির নাম হবে হলাসন। যে অবস্থানেই আসতে পার না কেন, সেই অবস্থায় থাক ১৫/২০ সেকেন্ড। পরে ধীরে ধীরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। এক কথায় শবাসন কর।

মৎস্যাসন: বিপরীতকরণী, সর্বাঙ্গাসন বা হলাসনের পর সাধারণত মৎস্যাসন ব্যায়ামটি করতে দেওয়া হয়। যাদের ঘাড়ে ব্যথা ও রক্তে উচ্চ চাপ রয়েছে তারা এই আসনটি করতে যেও না। পদ্মাসনে অর্থাৎ বাঁ জানুর উপর ডান পা ও ডান জানুর উপর বাঁ পা তুলে বস। এর পর ধীরে ধীরে কনুই মাটিতে দিয়ে শুয়ে পড়। তারপর মাটিতে কনুই-এর চাপ দিয়ে মাথার তালু মাটিতে লাগাও। পিঠ যতটা পার মাটি থেকে উঁচুতে তুলে দাও। দু'হাত দিয়ে দু'পায়ের বুড়ো আঙুল ধর। কনুই মাটিতে চেপে লাগিয়ে দাও। এটি মৎস্যাসন হলো।

এই ছবিতে মৎস্যাসনের সঙ্গে একটি ব্যায়ামও শেখানো হয়েছে। সামনের মেয়েটির মতো মৎস্যাসন করে হাত দুটি মুঠি করে দু'উরুর উপর রাখ। এখন শ্বাস নিতে নিতে হাত দুটি উঁচু করে তুলে মাথার পিছনে মাটিতে নিয়ে যাও। পরমুহূর্তেই শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে একই পথে হাত দুটি নিয়ে এস উরুর ওপর। নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা মিলে একবার হলো। প্রতি মাত্রায় ১০/১৫ বার কর। সব আসনগুলি ২/৩ মাত্রায় অভ্যাস কর।

লম্বা হবার অনেকগুলি আসন ও ব্যায়াম শেখালাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতে সকলেই উপকার পাবে। শরীরও ভাল হবে। মানসিক চাপ বেশি থাকলে একটি হরমোন বের হয় সেইটিও উচ্চতা বাড়তে দেয় না। এছাড়া পুরুষ হরমোন এন্ড্রোজেন ও নারী হরমোন ইস্ট্রোজেন যেমন শরীর বৃদ্ধির সহায়ক, তেমনি অতিক্ষরণও বৃদ্ধি হওয়া আটকে দেয়। নিয়মিত আসন সমস্ত গ্রন্থিগুলিকে সুস্থ সবল রাখে, ফলে তারা তাদের কাজ ঠিক মতো করে।

ছবি ২

নতুন ধাঁধা

১। তিন অক্ষরের শব্দ
মুখ কাটলেও হয় না জব্দ
পাই যে আবার শব্দ।
—স্নেহাশিস কুমার
সরিষাপাড়া/চন্দননগর

২। হৈ চৈ হয় সেথা
বিষের গোড়ায় ব্যাঙ যেথা।
—উদয় ভট্টাচার্য
আপার বাবুপট্টি/অসম

৩। জলের মধ্যে আকাশ দেখে
কলম চালায় ঠেসে।
—যীশু সাহা
শেওড়াফুলি/হুগলী

৪। আদি অন্তে আমার বটে
মধ্যিখানে কে?
ইংরাজিতে লোকে যাকে কাঁচা বলেছে।
সবটা কিছু অন্তরেতে প্রবেশ করেছে।
—মায়া ও রুমা মণ্ডল রানীগঞ্জ/বর্ধমান

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তরঃ
১। বামন ২। মাদল ৩। বলয় ৪। গোপন

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার শব্দমালার উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ
১। নোতরদাম ৫। সুকি ৬। বানপ্রস্থ ৮। আকন্দ ১০। জোক ১২। লম্বা ১৩। রবি ১৪। ববি ১৬। অগম ১৮। উনজেন ২১। কঙ্কা ২২। দলাইলামা

উপর-নিচঃ
২। তক্ষক ৩। দাবা ৪। মন ৫। সুস্থ ৭। প্রজা ৮। আনারস ৯। লিম্বারাম ১০। জোব ১১। কবি ১৫। জ্ঞান ১৭। গরিলা ১৮। উল্কা ১৯। জেদ ২০। নলা

বলো তো আমি কে?

সূত্র হেঁয়ালী

বিখ্যাত এক উপন্যাসের নায়ক আমি। আমার পরিচয় পেতে গেলে নিচের সূত্রগুলো দেখ:

সূত্র একঃ চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে আমার মতো তরোয়াল চালাতে ফ্রান্সে আর কেউ পারতো না।

সূত্র দুইঃ কিছু মজার রকমের ভুল বোঝাবুঝির ফলে তিনজন ভদ্রলোক আমাকে ডুয়েল লড়তে চ্যালেঞ্জ জানান। কিন্তু পরে তাঁরাই আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে যান।

সূত্র তিনঃ ফ্রান্সের রানীর বিরুদ্ধে যখন এক গভীর ষড়যন্ত্র হয় তখন আমি তাঁকে বাঁচাতে সাহায্য করি। ষড়যন্ত্রকারীদের হাত এড়িয়ে শত বিপদ মাথায় নিয়ে আমি ইংলণ্ডে ছুটে যাই।

সূত্র চারঃ আমি পরতাম রাজার নিজস্ব রক্ষীবাহিনীর পোশাক।

সূত্র পাঁচঃ আমার তিন বন্ধুই ছিল অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। তাঁদের সঙ্গী করে আমি ফ্রান্সের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করি। আমাদের শ্লোগান ছিল, 'ওয়ান ফর অল এ্যান্ড......'।

এবার বলো তো আমি কে? প্রথম সূত্র থেকে যদি আমাকে চিনতে পারো তাহলে বলব অসাধারণ; দ্বিতীয় সূত্র থেকে পারলে চমৎকার; তৃতীয় সূত্র হলে খুব ভালো; চতুর্থ সূত্র ভালো; আর পঞ্চম সূত্র থেকে পারলে মোটামুটি।

উত্তর পরের পাতায়।

নতুন শব্দমালা

শুকতারার মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেকগুলি শব্দ। সূত্র থেকে খুঁজে বের কর দেখি সেই শব্দগুলি।

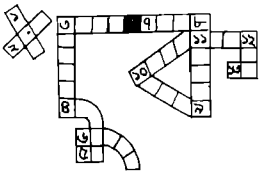

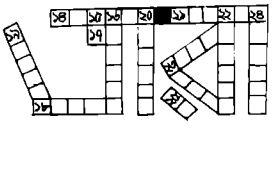

সূত্র☐

কোণাকুণি নিচে :

১। এককথায় ত্যাগের ইচ্ছা

৪। চন্দ্র সে তা ঠিক বটে/তারানাথ নামে রটে

৬। সাবধানে লেখ ভাই/সঙ্কীর্ণ জায়গা তাই

১০। পুরোপুরি উল্টে লেখো/মনঃসংযোগ মানে দেখো

১৯। উল্টো পাল্টা বুঝি না/পড়তে পেলে ছাড়ি না

২৩। বাংলা নাম যন্ত্রবিজ্ঞানী/কল চালনা করি আমি

২৫। বারবার ঘটে তাই/ব্যাপিয়া থাকিতে চাই

কোণাকুণি পাশে/উপরে :

২। বনমুরগী কেন হব, নাম আছে আলাদা

১০। জলেতে চিনি গুলে দিলাম/গরমে খেয়ে আরাম পেলাম

২৩। প্রাচীন কাহিনী যাতে পাই/বিষয়টা লেখে তাই

পাশাপাশি :

৩। তপসে এবং প্রদোষ মিটার/এঁর কলমেই আবিষ্কার

৫। উল্টে নিলে জাতি যেই/তেলের কারবার করে সেই

৭। জর্জরিত, ভারগ্রস্ত লেখে অভিধানে/নাকাল হলাম আমি দেখি তার মানে

১১। কবিতা আমি লিখিনি কভু/এদের রাজা বলছে তবু

১৩। কান দিয়ে শোনা যায় চোখ দিয়ে দেখা/ত্বক দিয়ে কি হয় তা বল দেখি খোকা

১৪। দেশমাতৃকার প্রণাম মন্ত্র/লিখে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র

১৭। অস্তিত্ব মানে যেই/বিদ্যমান হয় সেই

১৮। রেশমী সূতা মাঞ্জা দেওয়া/উড়াব ঘুড়ি ভুলে নাওয়া খাওয়া

২১। ন+ত্যাগ+সহন/মানে করো খোলো অভিধান

নিচে :

৩। এত কঠিন কাজটা/করত বটে ফেলুদা

৬। ভ্রমর কিংবা বৃশ্চিক/উত্তরটা একটু খানিক

৮। প্রথমাচারে রস বাকি দুটি কম কম/মানে করলাম ভাবভঙ্গি সেটা কি রকম

১২। হীরা মণি মুক্তা খচিত গহনা/বেশি নজর দিও না

১৫। বারো ভাগের এক ভাগ/তিরিশটা দিন একসাথে রাখ

১৬। তত্ত্বের খোঁজ নিরবধি/অভিধানে দেখ যদি

২০। ক এর লেজটা জুড়েই রাখ/বাংলা মানে ভেবে দেখ

২২। সত্যি কি তাই হয়েছে এটা/হলে সার্থক আমার চেষ্টা

২৪। অতি সুন্দর তিনি/দর্শনের আনন্দ যিনি

[এটি তৈরি করেছেন প্রিয়রঞ্জন সাহা, মণিকুন্তলা সাহা ও পিয়ালী সাহা।]

বলো তো আমি কে? উত্তর :
আমি হলাম আলেকজাঁন্দ্রে দুমার লেখা 'দ্য থ্রি মাশকেটিয়ার্স'-এর দারতাঁয়া।

ফাল্গুন সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

॥ কলকাতা ॥

সোমা, ডোরা ও টুটু/বেহালা; পাবু, টাবু, লাবু, রাজা, যীশু, গোগল, মিষ্টি, জয় ও রুমকি/বিজয়গড়; জয়দীপ, কাঁকন, পারিজাত, ও রণদীপ চক্রবর্তী/বেলগাছিয়া; অভিষেক দাস/লেক রোড; স্বপন, বিশাখা, বন্দনা, টুটু ও আঁখি দেবী/কসবা; শুভ, দীপ, বাণীকুমার, শিল্পী, পাপু, বাবু, চৈতালী ও সর্বাণী/চেতলা রোড; মালবিকা, ছায়ারানি ও গৌরদাস সাহা/পর্ণশ্রী পল্লী; পাপাই, পিংকি, রিংকি ও প্রমিলা বিবার/পর্ণশ্রী; পাপান, নীলু, ইন্দু, রুমা ও রূপা/নারকেলডাঙা; অরিন্দম ও সৌমেন চক্রবর্তী/গ্রীন পার্ক; ঝুনি, কুণাল ও মৃণাল চক্রবর্তী/বাঘা যতীন; শুভজিৎ ও পাপড়ি নন্দী/বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট; বাবাই, টুবাই, শঙ্কর, রূপা, অলকা, পার্থ ও কেয়া/বিধাননগর; অভিযান ও অলঙ্কার চক্রবর্তী/টালিগঞ্জ; আম্মা, তাতন, সজল, শিল্পী, তুলি, ও রুমা মজুমদার/এন. জি. বসাক রোড; আত্রেয়ী পাল/পাতিপুকুর হাউসিং এস্টেট; সুস্থির, ছন্দা, সমীর, রিতা, মৈনাক, গার্গী ও পাপাই মিত্র/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড; বুবাই, সোমা, মাম্ব ও বাণী/মানিকতলা রঞ্জন, প্রীতি, স্মৃতি ও টুকাই/বি. এল. সাহা রোড; মধুছন্দা, সবিতা ও সৈকত কুণ্ডু/নিউ বালিগঞ্জ; বাপ্টি, বাসবী, বনি, ভিকি, রজনী, সজনী, রোজারিও ও বাবা-মা/তালতলা; সুইটি, বিউটি, সানি, আমিন ও বাবা-মা/তালতলা; শতাব্দী ঘোষ/বাগুইহাটি; আমেনা, রেহানা, শামশাদ, শাহীন, মোঙ্গন, রেহানা, আসগর, তোলু ও আকবর/নর্থ রোড; শিপ্রা, মৌসুমী, শঙ্খ ও পৃথা ব্যানার্জী/বউবাজার; টুকটুক, পুতকি, খুকি, ভানু ও বাবা/সল্টলেক;

॥ মুর্শিদাবাদ ॥

মন্দিরা ও মধুরিমা মিত্র/বহরমপুর; শফি, কল্যাণ, পূর্ণেন্দু, সুজয় ও পলি/বহরমপুর; সুব্রত, চিত্রা, কার্তিক ও প্রদীপ/জিয়াগঞ্জ;

॥ আসাম ॥

উদয় ভট্টাচার্য/লামডিং; সমরকুমার দে/টিলু (বিজি) রেলকলোনী; রত্না, চয়ন, পিউ দত্তরায়/শিলং; পারুল, টুলু, মিলি, মিঠুয়া, জিত, যীশু ও পিকসি/হাইলাকান্দি; মাম, মৌ ও খোকনকাকু/গৌহাটি; সোনা ও বিজু/শিলং;

॥ বিহার ॥

ঋতুরাজ, গিরিরাজ, মনকী, মা ও বাবা/মোহলীশোল, সিংভূম; চূর্ণা, রনা, কুনা, তমি ও খনা/ জামশেদপুর; মা, বাবা, দাদু, বাচ্চু ও কাচ্চু/ধানবাদ; রাজদীপ ও সুদীপশঙ্কর গৌতম/হীরাপুর; মা, বাবা, কৌশিক ও সৌমিক আশ/ধানবাদ; মিতালী, চৈতালী, শক্তি ও সোমালী ভট্টাচার্য/ধানবাদ; জুঁই ও বাবলী নন্দন/দেওঘর; প্রিয়নাথ ও শুভ্রা মাজি/ ধানবাদ; শমীক সিদ্ধান্ত/মাইথনড্যাম; সৌরেন ও শৌভিক ঘোষ রায়/মৌভাণ্ডার; সুমনা বেরা/ ভরকুণ্ডা; অভিরূপ, গৌতম, মধুমিতা ও অনুপা/জামশেদপুর; নির্মল, শুভব্রত ও বাণীব্রত বিশ্বাস/সাহেবগঞ্জ;

॥ উড়িষ্যা ॥

দিয়া, সুস্মিতা ও অঞ্জন রায়/বিলাসপুর;

॥ গুজরাট ॥

বৈদ্যনাথ, কৃষ্ণা ও কিট্টু/ বরোদা;

॥ নিউ বম্বে ॥

সুদীপ মাজী/জুহুনগর;

॥ উত্তরপ্রদেশ ॥

পিস্তিক ও রিস্তিক/আগ্রা;

অনুবাদ সিরিজ

আলেকজাঁন্দ্রে দুমার

থ্রী মাশকেটিয়ার্স

(অনুবাদক- সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)

দাম : ১৬ টাকা মাত্র

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলি:-৯

প্রশ্নঃ—

১। ছাতা সর্বপ্রথম কারা ব্যবহার করে?

২। রবার্ট লুই স্টিভেনসান-এর 'ট্রেজার আইল্যান্ড' বইটির বদমাইশ জলদস্যুকে কি নামে ডাকা হতো?

৩। ১৬৬৬ সালে কোন বিখ্যাত শহরে বিধ্বংসী আগুন লাগে?

৪। কোন সম্রাট ছদ্মবেশে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ শেখেন?

৫। রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর 'জাংগল বুক'-এ যে বাঘটি আছে তার নাম কি?

৬। প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি কোথায় হয়?

জিজ্ঞাসা

উত্তরঃ—

১। ছাতা সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করে অ্যাসিরিয়ানরা। মিশরের প্রাচীন সব সমাধিসৌধে আর অ্যাসিরিয়ান ও পারসিয়ান ভাস্কর্যে ছাতার ছবি পাওয়া গেছে। স্যাকসনরা ছাতার কথা জানলেও ১৭০০ সালের আগে পশ্চিম দেশগুলোতে ছাতা তেমন জনপ্রিয় হয়নি। এরপরই লন্ডনে ছাতা নিয়ে আসেন জোনাস হ্যানওয়ে নামে একজন পর্যটক। তিনি পারস্যে ভ্রমণের সময় এটি দেখেছিলেন। আমব্রেলা শব্দটি এসেছে লাতিন আমব্রা শব্দ থেকে, যার মানে শেড বা ছায়া। প্রথম দিকে ছাতা সম্ভবত রোদ্দুর থেকে ছায়া পাবার জন্য ব্যবহার করা হতো।

২। লঙ জন সিলভার।

৩। লন্ডন।

৪। জার পিটার দ্য গ্রেট, যিনি ১৬৮৯ থেকে ১৭২৫ অবধি রাশিয়ার সম্রাট ছিলেন। ছোট থেকে কারিগরি বিষয়ে আগ্রহ থাকায় তিনি ছুতোরের কাজ ও ছাপার কাজ শেখেন। কিন্তু পরে কয়েকজন জার্মান লোকের সঙ্গে পরিচয় হতে বুঝতে পারেন যে তাঁর দেশ এসব ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তাই ১৬৯৭ সালে তিনি ২৫০ জনের একটি দলকে ওই সব দেশে পাঠান। তাদের সঙ্গে যান সার্জেন্ট পিটার মিকহাইলভ নামে এক ব্যক্তি। ইনিই হচ্ছেন ছদ্মবেশে জার পিটার। মিকহাইলভ সেজে তিনি চার মাস ডাচদের একটি জাহাজ- নির্মাণ কেন্দ্রে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করেন। তারপর ডেপ্টফোর্ডে ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রেও কাজ করেন। তিনি অনেক কারখানা ও স্কুলও দেখেন। এ সব বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ১৬৯৮ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি রাশিয়াকে আধুনিক ভাবে গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। রাশিয়ার নৌবাহিনীও তিনি গড়ে তোলেন।

৫। শের খান।

৬। নায়েগ্রা জলপ্রপাতে।

ছবি : রাহুল মজুমদার

বিলির জীবনে এলো একটি স্মরণীয় দিন

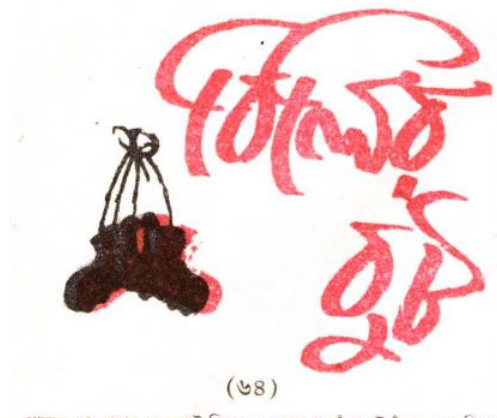

(৬৪)

প্রাক্তন খেলোয়াড় ডেড সট কিনের একজোড়া ছেঁড়া বুট খুঁজে পেয়েছিলো বিলি ডেন। বুটটা পরে খেললেই বিলির খেলা একদম ডেড সটের মতো হয়ে যায়। স্কুলের হেড বয় সিম্পসন বিলিকে একদম দেখতে পারে না। তাই স্কুল দল থেকে বাদ পড়লো সে। কিন্তু তখনই ডাক পেলো স্থানীয় ক্লাব মুরফিল্ড অ্যাভিনিউ থেকে...

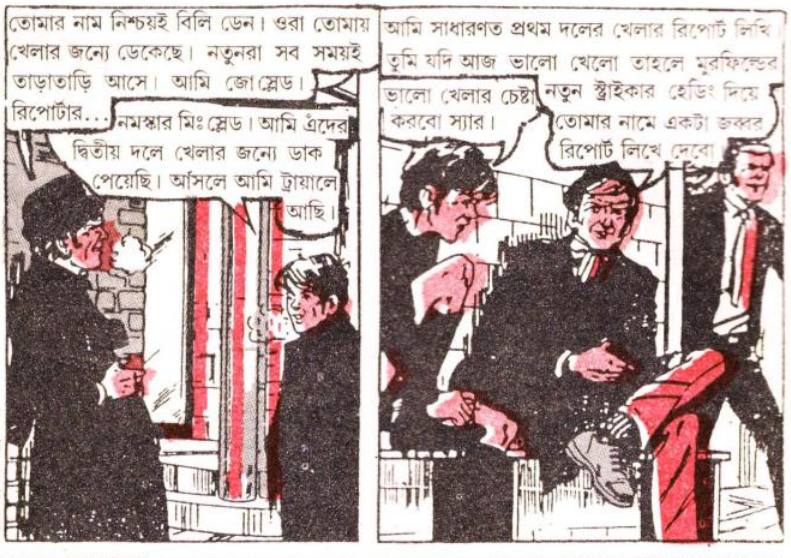

কুয়াশার জন্যে খেলা শেষ পর্যন্ত হতে পারলো না...
পিপ পিপ পিইইই পিপ্পপপপপ !
যাক...আমি তো খারাপ খেলিনি!
উনি খেলা বন্ধ করে দিলেন। তা ছাড়া উপায়ও ছিলো না।
উঃ কী কুয়াশা! দূরের কিছু দেখাই যাচ্ছে না। খেলা হবে কি করে?
একটু পরে সাজঘরে...
আমি তোমাদের মধ্যে চারজনকে ক্রিস্টমাসের দিন আমাদের প্রথম দলে খেলাবো। বার্টন, জোন্স, এঞ্জেল আর ডেন
আমি?
ক্রিস্টমাসের দিনের জন্যে আমরা কয়েকজন জুনিয়ার খেলোয়াড়কে রিজার্ভে রাখি বিলি। এবার অবশ্য আমাদের খেলা লীগের একেবারে নিচের সারির দল ব্ল্যাঙ্কফেরির সঙ্গে...
ধন্যবাদ স্যার! মুরফিল্ডের প্রথম দলে খেলার জন্যে ক্রিস্টমাস ডিনারের লোভ ছাড়া আমার কাছে কিছুই নয়!
খুশি মনে বিলি বাড়ি ফিরছিলো...
এই রে! আমি যে ঠাম্মার জন্যে ক্রিস্টমাসের উপহার কিনতে ভুলে গেছি। ভাগ্যিস মনে পড়লো...
তুমি এই রকমই একটা কিছু খুঁজছো তো!
হ্যাঁ, আমার ঠাম্মার জন্যে। উনি এগুলো সংগ্রহ করেন।
সেদিন সন্ধ্যেবেলায়
আরে, কাগজে কি লিখেছে দেখেছো— নবাগত বিস্ময় বালক স্থানীয় দলের পক্ষে খেলছে!
বিস্ময় বালক! কে সে?
সেদিনের সান্ধ্য দৈনিকে বিলির খেলার খবর বড় বড় হরফে ছাপা হলো।
স্থানীয় বিস্ময় বালক বিলি ডেন খেলতে নেমেই দারুণ গোল করেছে!
আজ কুয়াশার জন্যে মুরফিল্ড আভিনিউ-এর খেলা বন্ধ হয়ে যাবার আগেই স্থানীয় বিস্ময় বালক বিলি ডেন তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে দুর্দান্ত একটি গোল করেছে।
"...মুরফিল্ডের ম্যানেজার মিঃ বেলাটন আজই বিলি ডেনকে ক্রিস্টমাসের দিন লীগের খেলায় ব্ল্যাঙ্কফেরি দলে. বিরুদ্ধে খেলার জন্যে মনোনীত করেছেন। সাড়া জাগানো এই বিস্ময় বালকটির খেলা দেখতে ভুলবেন না!"
সর্বনাশ! স্লেড যে বড্ড বেশি করে লিখে ফেলেছেন। এ সব সত্যি নয় ওর লেখা পড়ে মনে হচ্ছে আমি যেন জর্জ বেস্ট!
কী হবে এবার... জানতে পারবে শুকতারার শ্রাবণ সংখ্যায়

শ্রীরূপমঞ্জরী দত্ত স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

দেবতা

চন্দ্রাণী দাশগুপ্তা

ডাক্তারবাবু আমার ছেলের কি হবে? ও বাঁচবে তো? ডাক্তারের দুটি হাত ধরে আকুল স্বরে প্রশ্ন করল বিধবাটি।

ডাক্তারবাবু সান্ত্বনার সুরে বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। শুধু তিন বোতল এ নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত লাগবে, তাহলেই হবে।

তাহলেই হবে—আশ্বাসের এই বাণী শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ছেলেটির মা।

প্রথমেই সে যায় ব্লাড ব্যাঙ্কে। কিন্তু হতাশ হতে হয় তাকে। তিন বোতল কেন এক বোতলও নেই এ গ্রুপের রক্ত সেখানে। অবশেষে ক্লান্ত বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে যায় সে। একমাত্র ছেলে তার। কি করবে সে এখন? কেমন করে বাঁচাবে ছেলেকে? হঠাৎ মনে পড়ল পাশের বাড়ির আফজল, সিরাজুল ও সিরাজকে। তারা তো বিপদে আপদে অনেক সাহায্য করে থাকে। একবার তাদের বলেই দেখা যাক না যদি তারা কিছু করতে পারে! এই ভেবে পাশের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে সে।

ভেতর থেকে জবাব আসে, আসছি। দরজা খোলে বড়ভাই আফজল। দেখে পাশের বাড়ির মাসিমা দাঁড়িয়ে আছে। বিধবাটি কেঁদে পড়ে তার কাছে। খুলে বলে ডাক্তার কি আশ্বাস দিয়েছে। রক্তের জন্য কিভাবে তাকে ছোটাছুটি করে ব্যর্থ হতে হয়েছে।

সব শুনে চটপট তৈরি হয়ে যায় তিন ভাই। আম্মিকে ডেকে বলে, আমরা একটু আসছি। ভীষণ দরকার। তারপর চারজন একটা ট্যাক্সি করে সোজা রওনা দেয় হাসপাতালে।

ছেলেটির মা তাদের ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে আসে। তারা বলে, ডাক্তারবাবু আমরা রক্ত দেব। আমাদের গ্রুপ আর ওঁর ছেলের রক্তের গ্রুপ এক। পাশ থেকে একজন বলে ওঠে, ওরা তো মুসলমান। ওদের রোজা চলছে, সারাদিন কিছু খায়নি।

তা শুনে ডাক্তারবাবু বলেন, তা হলে তো হবে না। না খেয়ে রক্ত দেবে কি করে। সে ধকল তো সইতে পারবে না? না না, আমি সে রিস্ক নিতে পারব না।

ওরা বলে, আমাদের কিছু হবে না ডাক্তারবাবু। আপনি নিন।

ডাক্তারবাবু তবু নারাজ। তখন তারা বলে ঠিক আছে, আমরা কিছু খেয়ে তবেই রক্ত দেব। আপনি চলুন।

পাশের ভদ্রলোকটি বলে ওঠেন, শেষকালে রোজা ভাঙবেন, তাও একজন ভিন্নধর্মের ছেলের জন্যে।

ওরা হাসে, বলে, মানুষের ধর্মই তো মানুষকে বাঁচানো।

ছেলেটির মা ওদের বুকে টেনে নেয়। বলে, তোমরা সত্যিই দেবতা। আজ বুঝলাম দেবতা শুধু মন্দিরে নেই, আছেন আমাদের সকলের মধ্যে। আমরা অন্ধ, তাই দেখতে পাই না।

শ্রীরূপমঞ্জরী দত্ত স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

শিশু গোপীনাথ

দেবরূপা দত্তরায়

বিপিনবিহারীবাবু একজন ডাকসাইটে উকিল। বয়স ষাটের ওপর। লম্বা-চওড়া, ফর্সা। মুখের মধ্যে সবচেয়ে দর্শনীয় ওঁর ইয়া বড় গোঁফজোড়া। ওঁর গম্ভীর স্বভাবের

জন্য সবাই ওঁকে ভয় করে।

বিপিনবাবুর নিজের বলতে আছে শুধু চাকর ভোলা আর গৃহসংলগ্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহ। সকাল সন্ধ্যে মন্দিরে গোপীনাথের পুজো হয়। সেই সময় যত রাজ্যের গরীব-দুঃখীরা এসে মন্দিরের সামনে জড়ো হয়। বিপিনবাবু প্রতিদিন দু'বেলা একশোটা করে লাড্ডু গোপীনাথকে নিবেদন করেন। উনি যখন বড় রুপোর থালাভর্তি লাড্ডু নিয়ে মন্দিরে ঢোকেন, সে সময় কারো সাধ্যি নেই ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। পুজোর শেষে গোপীনাথের প্রসাদ গরীব-দুঃখীদের বিতরণ করা হয়।

এমনি করেই দিনের পর দিন ঠাকুরের পুজো হয়ে আসছিল। একদিন সকালবেলা স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্রে রুপোর থালাভর্তি লাড্ডু নিয়ে বিপিনবাবু মন্দিরে চলেছেন। মন্দিরে ঢুকতে যাবেন এমন সময় একটি ছোট ভিখারী ছেলে ছুটে এসে তাঁর হাত ধরে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে থালাভর্তি লাড্ডু পড়ে গেল মাটিতে। মন্দির-প্রাঙ্গণ যেন মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ নিথর। পুরোহিতমশায়ের হাতের ঘন্টা থেমে গেছে। গরীব-দুঃখীরা পিছিয়ে যাচ্ছে পায়ে পায়ে। বিপিনবাবু মন্দিরদ্বারেই দাঁড়িয়ে আছেন....হুকুম হলো, এক গাছা বেত নিয়ে আয়। ভোলা বেত এগিয়ে দিল কাঁপা কাঁপা হাতে। বিপিনবাবু ছেলেটির দিকে তাকলেন, দেখলেন ও নিশ্চিন্তমনে একটার পর একটা লাড্ডু কুড়িয়ে খেয়ে চলেছে। প্রচণ্ড রাগে হাতের বেত তুললেন তিনি ছেলেটিকে মারবেন বলে। কিন্তু হঠাৎই তাঁর চোখ পড়ল মন্দিরের গোপীনাথের দিকে। বিপিনবিহারীবাবু দেখলেন গোপীনাথ সেই আগের মতোই হাসছেন। তাঁর ভোগ নষ্ট হওয়াতে তিনি এতটুকু রুষ্ট নন। বিপিনবাবু যেন শুনতে পেলেন গোপীনাথ ওঁকে বলছেন, ছেলেটি লাড্ডু খাচ্ছে বলে তুই রাগ করবার কে? ও তো আমার লাড্ডু খাচ্ছে। আমার খাওয়া যা ওর খাওয়াও তো তাই। আমি তো দীন-দরিদ্রের মধ্যেই বাস করি রে!

বিপিনবাবুর হাত থেকে বেত গাছাটা মাটিতে পড়ে গেল। উনি মাটিতে বসে পড়ে ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মন্দিরে আবার কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল।

ছবি : সুদী

এঁদের লেখাও ভাল।
রুণু মণ্ডল, কলকাতা-৩৪॥ রাজীবকুমার রায়, বর্ধমান-৬॥ কমলারানী বসু, কলকাতা-৫১॥ উত্তম মালাকার, বর্ধমান-৩॥ কবিতা চৌধুরী, দুর্গাপুর-৬॥ বীথিকা দাশ, লিড়ু, আসাম, ৭৮৬১৮২॥ মিতালী সেনগুপ্ত, কলকাতা-১০॥ সন্তোষকুমার দত্ত, কলকাতা-৫৯॥

ঘোষণা

স্বামী বিবেকানন্দর ভারত পরিক্রমার শতবর্ষ এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের শতবর্ষ উপলক্ষে শুকতারার পক্ষ থেকে বিশেষ গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা হবে নিচের তিনটি বিভাগে:

ক বিভাগ-১০ বছর পর্যন্ত—বিষয়ঃ গল্পের রাজা বিবেকানন্দ
খ বিভাগ-১১ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত—বিষয়ঃ সর্দার বিবেকানন্দ
গ বিভাগ-১৫ বছরের ঊর্ধ্বে—বিষয়ঃ শিক্ষক বিবেকানন্দ

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩১ জুলাই ১৯৯৩। কোনো লেখাই এক হাজার শব্দের বেশি হবে না। লেখার সঙ্গে লেখক-লেখিকার বয়েস, ক্লাস, স্কুল বা কলেজের নাম অবশ্যই দিতে হবে। লেখা পাঠাবার সময় খামের ওপর 'স্বামী বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি' কথাটি লিখে দিতে হবে। প্রত্যেক বিভাগে দুটি করে পুরস্কার থাকবে। তবে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প তিনটিই শুধু শুকতারার কার্তিক সংখ্যায় ছাপা হবে। প্রত্যেক বিভাগে পুরস্কার মূল্য সমান। প্রথম পুরস্কার—২৫০ টাকাঃ দ্বিতীয় পুরস্কার—১৫০ টাকা।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা—'স্বামী বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি'
C/O সম্পাদক শুকতারা, ১১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

কনরাড লোরেঞ্জের স্বর্গোদ্যান

আরতি বসু

প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরছিল কনরাড। দরজা অবধি পৌঁছনোর সবুরটুকুও যেন সইছে না। তাই ভদ্রতা সভ্যতা ভুলে রাস্তার মোড় থেকেই চেঁচাতে চেঁচাতে আসছিল, মা, ও মা, দরজা খোল। দরজা খোল শীগগির।

কনরাডের মা এতক্ষণ ওরই জন্য ঘরবার করছিলেন। ওর যত দেরি হচ্ছিল ততই তিনি অধীর হয়ে উঠছিলেন। এতক্ষণে ছেলের সাড়া পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালেন। যেরকম ছুটে আসছে ধাক্কাই লাগিয়ে বসবে হয়তো। কিন্তু দরজার মুখে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল কনরাড। ভীতু গলায় জিজ্ঞেস করল, মা, গ্লোরিয়া?

মা শান্তভাবে হেসে বললেন, না রে, কোনো গোলমাল করেনি, চিৎকার চেঁচামেচি কিচ্ছু না। আমি অবশ্য রান্না নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। তোর পড়ার ঘরে ঢুকে দেখিনি।

উঃ! বাঁচলাম। যা ভাবনা হয়েছিল না! বলতে বলতে ধুপধাপ করে দুটো করে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে কনরাড ছুটল ওর পড়ার ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকে অভ্যাসমতো হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ টিপল। কিন্তু আলো জ্বলল না। কী ব্যাপার, আলো জ্বলছে না কেন?

গ্লোরিয়া! গ্লোরিয়া! অন্ধকারের মধ্যেই ডাকল কনরাড। খিক খিক শব্দ করে সাড়া দিল গ্লোরিয়া। যেটাকে কনরাড বলে গ্লোরিয়ার হাসি। তা সেই হাসির আওয়াজ মোটেই তার খাঁচার মধ্যে থেকে এলো না, এলো ছাদের দিকের কোনো একটা জায়গা থেকে। ব্যস্তসমস্ত কনরাড আবার ছুটল নিচে রান্নাঘরে, মার কাছ থেকে একটা মোমবাতি আনতে। মোমবাতি জ্বালিয়ে এনে ঘরের চেহারা দেখে চক্ষুস্থির কনরাডের। যেন ছোটখাট একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে সেখানে। খাঁচার দরজা খোলা। বালিশ, বিছানা, জামাকাপড় জলের গেলাস—সব ছত্রাকার। তার মধ্যে ছেঁড়া বইয়ের কয়েকখানা পাতা উড়ে বেড়াচ্ছে ফরফর করে। আর গ্লোরিয়া লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে জানালার মাথায়, পর্দার রডের ওপর। ততক্ষণে কনরাডের মা-ও উঠে এসেছেন কী হয়েছে দেখবার জন্যে। ছেলের পিছন দিক থেকে উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতরটা একবার

দেখে নিয়ে বললেন, আলোটা জ্বলছে না কেন দেখ আগে।

হ্যাঁ, তাইতো! বাতি হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কনরাড আর সঙ্গে সঙ্গে এমন চমকে উঠল যে বাতিদান থেকে জ্বলন্ত মোমটা উল্টে পড়ে যায় আর কি। একি সাংঘাতিক কাণ্ড করেছে গ্লোরিয়া! বিছানার পাশে দাঁড় করানো ব্রোঞ্জের ভারি লাইটটা প্লাগ লাগানো অবস্থায় টেনে হিঁচড়ে অ্যাকোয়ারিয়ামটার ওপরে চড়িয়েছে তারপর ওপরের ডালাটা ভেঙে ডুবিয়ে দিয়েছে জলের ভেতর। অশেষ ভাগ্য কনরাডের যে শক খেয়ে গ্লোরিয়া মরে পড়ে থাকেনি। শর্ট সার্কিট হওয়ার দরুন শুধুমাত্র ঘরের ফিউজ তারটা পুড়ে গেছে। তাই আলো জ্বলছে না।

সেদিন রাতে খাবার টেবিলে বসে অপরাধী অপরাধী গলায় কনরাড মা-বাবাকে বললো, এ রকম আর কক্ষণো হবে না, তোমরা দেখে নিও। গ্লোরিয়ার খুব বুদ্ধি। তবে কি জানো, ওর কৌতূহলটা একটু বেশি তো, তাই।

কনরাডের বাবা-মা চুপচাপই মাথা নেড়ে সায় দিলেন ছেলের কথায়। উপায় কী? ছেলে যে জীবজন্তু বলতে অজ্ঞান। ওদের নিয়ে ও নাকি কী সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চায়। তাই দুদিন একদিন ছাড়া ছাড়াই কোনো না কোনো জন্তু-জানোয়ার এনে হাজির করে বাড়িতে। এদের কাউকেই নাকি বেশি শাসন করা বা বেশিক্ষণ খাঁচায় বন্দী করে রাখা উচিত নয়। তাতে নাকি এদের প্রকৃত স্বভাবটার হিসাব পাওয়া যায় না। তবু কাপুচিন প্রজাতির এই নতুন বাঁদরীটাকে যখন কনরাড এনে হাজির করেছিল তখন ওর বাবা নিজেই উদ্যোগী হয়ে বড়সড় একটা খাঁচা বানিয়ে এনে দিয়েছিলেন ছেলের পড়ার ঘরে। যাতে কনরাডের অনুপস্থিতির সময়টুকু অন্তত সে বন্ধ থাকে। ছেলের অনুসন্ধিৎসায় তিনি বাধা দিতে চান না। কিন্তু বাড়িতে একটু শান্তি-শৃঙ্খলা থাকাও তো দরকার।

খাঁচা দেখে কনরাডের প্রথমে মন খারাপ হলেও বাবার যুক্তিটা খুশিমনেই মেনে নিয়েছিল। কারণ কাক-কোকিল-হাঁস-মুরগী-কাকাতুয়া-ইঁদুর-বাঁদর আর খরগোশদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে সে এটা বেশ বুঝতে পেরেছে যে উন্নত ধরনের জীবজন্তুর মধ্যে যাদের বুদ্ধি বেশি তাদের কৌতূহলও বেশি। সেজন্য তাদের কাউকে কাউকে, বিশেষ করে বাঁদরদের বেশিক্ষণ চোখের আড়ালে রাখা যায় না বা ছেড়ে রাখা যায় না। রাখলেই একটা না একটা ক্ষতি করে দেবে। বাড়ির খুঁটিনাটি সব জিনিসেই যে এদের অপরিসীম আগ্রহ। তার ওপর নতুন কিছু দেখলে তো আর রক্ষে নেই, সবিক্রমে ধরে টানাটানি শুরু করে দেবে সেটা। শুধু লেমুর জাতীয় বাঁদররাই যা একটু শান্ত আর কম কৌতূহলী। কনরাডের ধারণা লেমুরদের বুদ্ধিশুদ্ধিও কম অন্য বাঁদরদের থেকে।

এইজন্যই গ্লোরিয়াকে আনার পর থেকে কনরাড কলেজের সময়টুকু ছাড়া বেশির ভাগ বাড়িতেই থাকে। যতক্ষণ ও বাড়ি থাকে গ্লোরিয়া ওর পড়ার ঘরে মনের আনন্দে দাপাদাপি করে। বেরুবার সময় কনরাড ওকে খাঁচায় বন্ধ করে বেরোয় বলে গ্লোরিয়ার খুব রাগ। প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে ও রাগ দেখায় আর সমস্ত বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে লেগে পড়ে খাঁচার দরজা খুলে ফেলার কৌশল আবিষ্কারে। সে কৌশলটা ও আজ বুঝে ফেলেছে। আর তারপরই এই কাণ্ড। এখন কনরাডের মনে হচ্ছে গ্লোরিয়া নয়, অন্যায়টা যেন সে নিজেই করেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর কনরাড আবার মাকে বলল, মা, তুমি রাগ করনি তো? আর এমন হবে না। এখন থেকে আমি ওকে খুব সাবধানে রাখব।

মা হেসে বললেন, রাগ করলে কি ওকে আর একমুহূর্ত রাখতে দিতাম বাড়িতে। তবে এরপর যেন বাঘ সিংহ এনে হাজির করো না।

পরদিন কনরাড খুব ভাল করে খাঁচার দরজা আটকে, জিনিসপত্র ঠিক করে গুছিয়ে কলেজ গেল। ফিরে এসে দেখল আলো জ্বলছে বটে ঘরে কিন্তু খাঁচার দরজা এবং বইয়ের আলমারির পাল্লা দুটোই হাট করে খোলা। ফিজিওলজি ও মেডিসিনের বই দুটো আধছেঁড়া অবস্থায় অ্যাকোয়ারিয়ামের জলে ডোবানো!

এক আধদিন নয়, এরকম ঘটনা কতবার যে ঘটেছে কনরাড লোরেঞ্জের বাড়িতে তার হিসেব নেই। সেই যখন তিনি বাবা-মার সঙ্গে ভিয়েনায় থাকতেন, পড়াশুনো করতেন তখন থেকেই। তারপর তিনি রিসার্চ করেছেন, ভিয়েনা ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন, প্রাণীবিজ্ঞানী হিসাবে যথেষ্ট নাম হয়েছে, বিয়েও করেছেন। বাড়ির হাল কিন্তু সেই একই রকম। কনরাডের বাবা-মার মতো তাঁর স্ত্রীও তাঁর এই বিচিত্র খেয়াল মেনে নিয়েছেন। যত অসুবিধেই হোক কক্ষণো বিরক্ত হন না কনরাডের স্ত্রী। বাড়ির মধ্যে পোষা ইঁদুর ছোটাছুটি করে বেড়ায়। সুন্দর সুন্দর চাদর, টেবিল ক্লথ, পর্দা গোল গোল করে কেটে নিয়ে নিজেদের পছন্দমতো বাসা বানায় তাঁর সবচেয়ে পছন্দসই টুপির মধ্যে। পোশাক-আসাক কেচে মেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। তাহলেই আদরের কাকাতুয়ারা সবগুলো বোতাম ছিঁড়ে রেখে দেবে। তবে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করে একটা ছাইরঙের রাজহাঁস। কনরাডদের শোবার ঘর ছাড়া সে অন্য কোথাও শোবে না আর ভোর হতে না হতেই বিশ্রী চিৎকার শুরু করে দেবে। কি? না জানালা খুলে দাও, আমি বাইরে উড়ে যাব।

এই সব আহ্লাদেপনাই সহ্য করেন কনরাড লোরেঞ্জের স্ত্রী। কারণ কনরাড তাঁকে বুঝিয়েছেন খাঁচায় আটকে রাখলে ওরা কি রকম মনমরা হয়ে থাকে দেখেছ? ওদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি প্রাণচাঞ্চল্য সবই তখন চাপা পড়ে যায়। অথচ যখন স্বাধীনভাবে থাকে তখন ওদের হাবভাব কী অসম্ভব আকর্ষণীয়। তাছাড়া আমাদের প্রত্যেককে ওরা খুব ভালবাসে। দেখ না, তাই কক্ষণো

আমাদের বাড়ি আর বাগান থেকে কোথাও যায় না।

কনরাডের এ কথাটা কিন্তু খুবই সত্যি। অন্যদের বাড়িতে খাঁচার দরজা শক্ত করে বন্ধ রাখতে হয় যাতে পোষা টিয়া-খরগোশরা পালিয়ে না যায়। আর কনরাডদের বাড়িতে কাজের সময় মিসেস লোরেঞ্জকে দরজা-জানালা বন্ধ রাখতে হয় যাতে ওরা ঢুকে পড়ে কাজকর্ম ভণ্ডুল করে না দেয়। ইদানিং তিনি একটা কাকতাড়ুয়ার সন্ধান পেয়েছেন। সেটা হলো ওঁর লাল টুকটুকে একখানা ছাতা। কে জানে কেন এই ছাতাটাকে সবাই খুব ভয় পায়। বিশেষ করে ভয় পায় ডানপিটে রাজহাঁসগুলো। তাই বাগানে নতুন সবজির চারা কিংবা ফুলের চারা লাগালে ঐ লাল ছাতাটা হাতে নিয়ে পাহারায় বসে যান মিসেস লোরেঞ্জ। নতুবা রাজহাঁসগুলো একটা চারাও রাখবে না। লাফিয়ে মাড়িয়ে সবগুলো শেষ করবে।

মিসেস লোরেঞ্জ সবথেকে বিপদে পড়েছিলেন তাঁর ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে। মাত্র কয়েকদিন বয়েসের শিশুপুত্রকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরা মাত্রই তাঁকে সমস্বরে স্বাগত জানাতে ছুটে এল কয়েকটা দাঁড়কাক, দুটো কাকাতুয়া, দুটো লেমুর আর দুটো কাপুচিন বাঁদর। ইঁদুর-খরগোশ-কাঠবিড়ালীদের উঁকিঝুঁকি তো আছেই। একরত্তি একটা শিশুর পক্ষে এরা বিপজ্জনক বৈকি। কনরাড নিজেও একটু চিন্তায় ছিলেন। অথচ এদের সবাইকে খাঁচায় আটকে রাখার কথা তিনি চিন্তাও করতে পারছেন না। বুদ্ধি যোগালেন তাঁর স্ত্রী-ই। বললেন, বাগানের ছায়াঢাকা জায়গায় একটা মজবুত বড় খাঁচা তৈরি করে দাও। দোলনা-টোলনা সমেত বাচ্চাকে আমি সেখানেই রাখব। তাহলে তো আর তোমার দস্যিগুলো কিছু করতে পারবে না।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন কনরাড।

ভোরবেলা ডানুব নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে ডঃ কনরাড লোরেঞ্জ ভাবছিলেন তাঁর জীবনের ঐ সব বিচিত্র ঘটনাগুলোর কথা। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা বলেন, এসব নাকি তাঁর পাগলামি। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, এত কষ্ট করে, এত অর্থ নষ্ট করে আপনি কী পেয়েছেন? কনরাড কিছুতেই তাঁদের বোঝাতে পারেন না, খুঁটিয়ে জানতে হলে ওদের ছেড়ে রাখাই দরকার। তাছাড়া এই যে অবাধ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও ওরা তাঁর কাছে কাছেই থাকতে চায়, এই ভালবাসার দাম কি কম? ওরা ওদের ভালবাসা দিয়ে যে কনরাডকে কিনে রেখেছে।

চিন্তায় ছেদ পড়ল একটা দাঁড়কাকের চিৎকারে। ওডিন দেবতার বাহনটি প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। মুখ তুলে অনেকটা ওর ভাষাতেই সাড়া দিলেন কনরাড। অমনি ডানা গুটিয়ে নিচে ঝাঁপ দিল দাঁড়কাকটা। সাঁ সাঁ করে নেমে এসে শরীর ভাসিয়ে আলতো ভাবে বসল ওঁর কাঁধের ওপর। গলার রুক্ষ কর্কশ আওয়াজটাকে যথাসাধ্য নরম করে জানতে চাইল, তোমাকে ব্যথা দিলুম না তো? কনরাড ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, দূর পাগল, তোরা কি কখনো আমাকে ব্যথা দিস?

শীতের শেষ। ডানুবের জলে ঘরমুখো যাযাবর পাখিদের মেলা। এই মেলা দেখতেই এসেছেন কনরাড। দাঁড়কাককে কাঁধে নিয়ে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখছেন তাদের ওঠাপড়া, ডানা ঝাপটানো, শুনছেন তাদের ঘরে ফেরার আনন্দ কাকলি। হঠাৎ কনরাডের চোখ পড়ল একটা ছাইরঙা ডানাভাঙা রাজহাঁসের দিকে। ওকে দেখে আরেক জনের কথা মনে পড়ে গেল কনরাডের। একটা বুনো রাজহাঁস তখন সদ্য এসে জুটেছে তাঁর পুষ্যি রাজহাঁসদের দলে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে যেটা দুষ্টু, যেটা সারাক্ষণ বাড়ির মধ্যে উৎপাত করে তার সঙ্গেই বেশি ভাব নতুনটার। একদিন বন্ধুর পিছু পিছু সেও এসে ঢুকেছিল ওঁর শোবার ঘরে। ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে ঘুরে ফিরে দেখছিল চারদিক। এমন সময় ঘরের দরজাটা হঠাৎ দড়াম করে বন্ধ হয়ে যেতেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল বেচারা। চমকে উঠে উড়ে যেতে চাইল ওপরে। আর তাতেই ঘটে গেল আর এক বিপত্তি। মস্ত ঝাড়লণ্ঠনটায় ধাক্কা খেয়ে সে আছড়ে পড়ল মাটিতে। ঝাড়লণ্ঠনের খানিকটা অংশ তো ভাঙলই, তারও ডানা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল অনেকগুলো পালক। অনেক চিকিৎসা করেছিলেন কনরাড তবু ডানাটা পুরোপুরি সারল না। এই ঘটনার পরও বহুদিন সে ছিল তাঁর বাড়িতে। তারপর একদিন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে উড়ে গেল কোন নিরুদ্দেশে।

এ কি সেই? যদি সে-ই হয় তাহলে ওর কি মনে আছে তাঁর কথা? তাঁর বাড়ির কথা?

কনরাড দেখলেন হাঁসটা হঠাৎ জল থেকে উঠে ডানা মেলল আকাশে। সঙ্গ নিল আরও একজন। কোনদিকে যাচ্ছে ওরা? কনরাডের বাড়ির দিকে না? তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন কনরাড। দূর থেকে বারান্দায় ওঠার সিঁড়িটা নজরে আসতেই আনন্দে বুক ভরে গেল। না, ভুল হয়নি তাঁর। এরাই তাঁর সেই হারানো মানিকজোড়। ঐ তো আগের মতোই লম্বা গলা বাড়িয়ে, ডানা ছড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে আসছে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে।

এই তো স্বর্গের সুখ, স্বর্গের আনন্দ। এর তুলনা কি আছে কোথাও? এর চেয়ে বড় পাওয়া তাঁর কাছে যে আর কিছুই নেই!

[কনরাড জেড. লোরেঞ্জের 'কিং সলোমন'স রিং' অবলম্বনে]

ছবি—রাহুল মজুমদার

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং কামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

বই মেলায় বেরুলো
নিউ বেঙ্গলের সাহিত্য সম্ভার

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের **বিদেশিনী**	অগ্নিমিত্রর **দেশ থেকে দেশান্তর**	ডঃ দীপক চন্দ্রর **হরিবংশ**

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের **ক্রিকেট মাঠের বাইরে**

ক্রিকেট মাঠের বাইরে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। নেপথ্যে সেই সব ঘটনা খেলোয়াড়দের জীবনকে হাসি-কান্নার রঙের রাঙিয়ে দেয়। গল্প উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সেই সব কাহিনী নিয়ে এই প্রথম বাংলায় একটি বই বেরুল

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যর **পেরুতে সূর্য লাল**	দিলীপ ভট্টাচার্যর **প্রবাস প্রেম**	আভা বসুর **সাগর দুহিতা**

দেবনারায়ণ গুপ্তর **বাংলার নট-নটী**	শতদল ভট্টাচার্যর **নিশুতি রাতের মহাত্মা**

ময়ূখ চৌধুরীর **দেবী দর্শন**	ডাঃ কল্যাণ চক্রবর্তীর **বিপন্ন প্রকৃতি**	রাধারমণ রায়ের **অদ্ভুত গোয়েন্দা**

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
(নতুন সংস্করণ)

ক্রিকেট খেলার আইন কানুন
ফুটবল খেলার আইন কানুন
ফুটবল ক্রিকেটের আইন

দীপংকর বিশ্বাসের **মজানো দশ**	অরুণ সর্দারের **অনাহূত**	আশুতোষ মন্ডলের **নতুন আলো**

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

Registration No. W B./E. C.—60 June '93 "Suktara"

পেটের গোলমাল ?
অম্লরোগ? ক্ষুধামান্দ্য? কোষ্ঠকাঠিন্য?

ডাঃ সরকার বলেন—

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভার।

যদি লিভার ও স্টম্যাকের কাজ ভালো না হয় বা মানসিক অশান্তি জনিত ভালো ঘুম না হয়, তবেই পেটের গোলমাল হয়। সর্বাধিক রোগের কারণ এই পেটের গণ্ডগোল, তাই যদি সুস্বাস্থ্য চান — পেটের গোলমাল সারান, আর লিভারের সুরক্ষায় হন যত্নবান।

পেটের গোলমাল সারাতে ও লিভারের সুরক্ষায়

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসু আবিষ্কার (মাইকেল মধুসূদন একাডেমী পুরস্কৃত)

লিভোসিন - আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক।

ব্যবহার বিধি ঃ

দু-চা চামচ করে লিভোসিন এক গ্লাস অল্প গরম জল-সহ সকালে খালি পেটে ও রাতে শোয়ার আগে সেবন করুন, যতদিন না- বুক জ্বালা সারে, হজমশক্তি বাড়ে, অম্লরোগ, ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, পেটের গোলমাল সারে আর সৌন্দর্য বাড়ে।

লিভোসিন

লিভার করেক্টিভ, কারমিন্যাটিভ অ্যাপিটাইজার, রেস্টোর‍্যাটিভ-টনিক।

অ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারক ঃ

জুপিটার ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাঃ লিঃ

২৫, ইডেন হস্পিটাল রোড, কলিকাতা-৭৩

ফোন ঃ ২৬-০১৫৬/২৭-০২২৪/৭৭-৭০৭৫/৩৩-৭০২৬

সমস্ত অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়।

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার নির্মাতাদের সহযোগী সংস্থা Jupiter এর আয়ুর্বেদিক গবেষণার একটি উপহার।

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা

Allen's Ad. India